ভৌতিক ও অলৌকিক কাহিনী

গোপালচন্দ্র রায়

ভৌতিক ও অলৌকিক কাহিনী

গোপালচন্দ্র রায়

পারুল প্রকাশনী
www.parulprakashani.com

ভৌতিক ও অলৌকিক কাহিনী

গোপালচন্দ্র রায়

পারুল প্রকাশনীর প্রথম প্রকাশ ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ : ২০১২

প্রচ্ছদ শিবেন্দু সরকার

বর্ণ সংস্থাপন পারুল প্রকাশনী

পারুল প্রকাশনীর পক্ষে ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে
রত্না সাহা কর্তৃক প্রকাশিত এবং আই-প্রেস ৩০এ ক্যানেল ইস্ট রোড
কলকাতা ৭০০ ০১১ থেকে মুদ্রিত

৬০.০০

অধ্যাপক ড. দীপঙ্কর রায়
কল্যাণীয়েষু

গ্রন্থকারের নিবেদন

মানুষ ম'রে গিয়ে আবার দেখা দিলে, আমরা সাধারণত তাকেই ভূত বলি। কিন্তু এই ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে যে মতভেদ, তা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে। একদল বলেন— ভূত আছে। অপর দল বলেন— ভূত নেই।

যাঁরা ভূত বিশ্বাস করেন না, তাঁরা ভূত বিশ্বাসীদের বলেন— ও আপনাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম। আপনারা অন্য কিছু দেখে, তাকেই ভুলবশতঃ ভূত বলে থাকেন।

ভূত বিশ্বাসীরা বা ভূত প্রত্যক্ষকারীরা, ভূত দেখার ব্যাপারে সকলেরই যে সর্বত্রই দৃষ্টিভ্রম হয়, একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন— ভয়ে কারও কারও দৃষ্টিভ্রম হতে পারে সত্য, কিন্তু তাই বলে সকল ক্ষেত্রেই যে হয়, তা মোটেই নয়। তাঁরা সজ্ঞানে ও সুস্পষ্টভাবেই ভূত দেখেছেন এবং নানাভাবে ভূতের পরিচয়ও পেয়েছেন।

তাঁরা আরও বলে থাকেন, মানুষ মৃত্যুর পরে দেখা না দিলেও, পরলোকে তাঁর অশরীরী আত্মার যে অস্তিত্ব থাকে এবং ইচ্ছা করলে সেই আত্মা কাউকে অবলম্বন করে এই মর্ত্যে যে নেমে আসতেও পারে, তারও প্রমাণ তাঁরা দেখেছেন।

পাশ্চাত্য দেশের জজ ডব্লিউ এড্মন্ড, জেমস্ বার্ণস, অলিভার লজ প্রমুখ পরলোকতত্ত্ববিদ্রা পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা করে এইটাই দেখিয়েছেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মাকে প্ল্যানচেট প্রভৃতির সাহায্যে আনা যায় এবং তার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানও করা যায়।

আমাদের দেশের পরলোকতত্ত্ববিদ্রাও এই প্ল্যানচেট প্রভৃতির সাহায্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণও দেখিয়েছেন। আমাদের দেশের শুধু পরলোকতত্ত্ববিদ্রা কেন, আমাদের দেশের সাধুসন্তরাও এই পারলৌকিক আত্মাকে যেমন নিজেরা দেখেছেন, অপরকেও তেমনি দেখিয়েছেন। যেমন—

১. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বৃন্দাবনে থাকার সময় একদিন হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়েই তাঁর শিষ্যদের বলে উঠেছিলেন— ওই দেখ, এইমাত্র বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের মহাপ্রয়াণ হয়ে গেল। আমি তাঁকে শূন্যে চলে যেতে দেখতে পাচ্ছি। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যবর্গ পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন, ওইদিন ঠিক ওই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোকগমন করেন।

২. ভোলা গিরি হরিদ্বারে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ সোমেশ বসুর মৃতা স্ত্রীর আত্মাকে আনিয়ে এবং পাশাপাশি আসনে সোমেশবাবু ও তাঁর স্ত্রীর আত্মাকে পূর্ব দেহ ধারণ করিয়ে বসিয়ে, সোমেশবাবুকে সস্ত্রীক দীক্ষা দিয়েছিলেন।
৩. স্বামী বিবেকানন্দ এক ভূতের অনুরোধে তাকে উদ্ধার করবার জন্য তার পিণ্ড দিয়েছিলেন। ইত্যাদি।

যাই হোক, পরলোকতত্ত্ব বা ভূততত্ত্ব নিয়ে লোকের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, সকল সভ্যদেশেই কিন্তু ভূত ও পরলোক নিয়ে সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রচুর সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে আসছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিদেহরাজ জনকের সভায় ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা কালে যে ভূতে-পাওয়ার গল্পটি আছে, সেইটিই বোধকরি আমাদের দেশের আদি ভৌতিক কাহিনী।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও পিতৃপুরুষ নামে একশ্রেণির অশরীরী আত্মার কথা রয়েছে। অথর্ব বেদে ভূতের কাহিনীই নয়, ভূত ছাড়ানোর মন্ত্রও আছে। অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং পালি প্রাকৃত সাহিত্যেও ভৌতিক কাহিনীর অভাব নাই। আর আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির তো কথাই নাই। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, মণীন্দ্রলাল বসু, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ পাল, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকই বাংলা ভাষায় ভালো ভালো ভূতের গল্প রচনা করেছেন।

এই সকল সাহিত্যিকদের সকলেই যে ভূত প্রত্যক্ষ করেছেন, তা নাও হতে পারে। এঁদের কেউ কেউ হয়ত নিছক গল্প রচনা হিসাবেই ভূতের গল্প লিখেছেন। কিন্তু এই বাংলা দেশেরই এমন বহু সাহিত্যিকের কথা আমি জানি, তাঁরা ভূত বা পরলোক নিয়ে গল্প রচনা না করলেও, তাঁরা ভূত প্রত্যক্ষ করেছেন এবং মৃত ব্যক্তির আত্মার নিকট হতে প্ল্যানচেট প্রভৃতির সাহায্যে অনেক প্রশ্নের উত্তর আদায় করেছেন।

বাংলার সাহিত্যরথীদের প্রত্যক্ষ করা বা বিশ্বাস করা ভৌতিক কাহিনীগুলি নিয়েই এই গ্রন্থটি রচনা করেছি।

বইটি অনেকদিন আগেই লিখে প্রকাশ করেছিলাম। তখন অল্প দিনের মধ্যে সব বই বিক্রিও হয়ে গিয়েছিল। তারপর অন্য লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এ বই আর ছাপা হয়নি। এখন প্রকাশকের আগ্রহে আবার ছাপা হল।

আমার পুত্র দীপঙ্কর ছেলেবেলায় ভূতের গল্প পড়তে ভালোবাসতো বলে তার সপ্তম জন্মদিনে (২৬ জানুয়ারি ১৯৬৩) বইটি লিখে তাকে দিয়েছিলাম। দীপঙ্কর আজ বয়সে এবং শিক্ষায় অনেক বড়ো হয়েছে। সে এখন আমেরিকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও গবেষক এবং নিজে সাহিত্যিক ও শিল্পী।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা পড়ে আমার মতো দীপঙ্করও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্য পথে রয়েছে। তবুও এবারও তাকেই আবার বইটি দিলাম।

গোপালচন্দ্র রায়

সূচি

বঙ্কিমচন্দ্রের ভৌতিক অভিজ্ঞতা

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন বর্ধমানের স্পেশাল সাবরেজিস্ট্রার। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় মাঝে মাঝে সঞ্জীবচন্দ্রের নিকট বেড়াতে যেতেন।

সঞ্জীবচন্দ্র ছাড়া বর্ধমানে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকজন বন্ধুও বাস করতেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন, দিগম্বর বিশ্বাস। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, দিগম্বরবাবু তখন সেখানে সাব্‌জজ ছিলেন। সেই থেকেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। দিগম্বরবাবুর সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রেরও বন্ধুত্ব ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র একবার বর্ধমানে গিয়ে সন্ধ্যার সময় সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে দিগম্বরবাবুর বাড়ি বেড়াতে যান। দিগম্বরবাবুর বাড়িতে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সেদিন অতিথি ছিলেন।

ওইদিন দিগম্বরবাবুর বাড়িতে এক ব্রাহ্মণ এসে সকলের সামনে এক অদ্ভুত খেল দেখিয়েছিল। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার সময় সভার মধ্যে মন্ত্রাদি পাঠ করে একটা থালা রাখল এবং তার উপর অঞ্জলিবদ্ধ করে কি সব বলতে লাগল, আর অমনি থালায় টপ্ টপ্ করে সন্দেশ পড়তে শুরু করল। এইভাবে সে প্রায় দু-সের সন্দেশ আনল।

এই দেখে সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও মহা বিস্মিত হলেন। তিনিই সর্ব প্রথম একটি সন্দেশ ভেঙে দেখলেন, কিন্তু খেলেন না। দিগম্বরবাবুর পুত্ররা সেই সন্দেশের অনেকগুলি খেলেন।

এই দেখে, সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র সকলের কাছে বলেছিলেন— আমি দৈবে ও প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করি। ও সব কিছু বুঝা যায় না, কি থেকে কি হয়, তা বলা কঠিন।

তিনি আরও বলেছিলেন— এমন অনেক ঘটনা আমি দেখেছি, যা লোকের কাছে বলা ঠিক নয়, আবার অবিশ্বাস করাও ঠিক নয়।

দিগম্বরবাবুর পুত্র তারকনাথ বিশ্বাস সেদিন ওই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর "বঙ্কিমবাবুর জীবন কথা" গ্রন্থে এই কাহিনীটি লিখে গেছেন।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। শ্রীশবাবু মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বেড়াতে যেতেন।

একবার শ্রীশবাবুর স্ত্রী এক অদ্ভুত রকমের হিস্টিরিয়া রোগে ভোগেন। সেই সময় শ্রীশবাবু একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশবাবুর স্ত্রীর অসুখের খবর শুনে সেদিন তাঁকে বলেছিলেন— আমার ছোট মেয়ের একবার প্রায় ওই ধরণেরই অসুখ হয়েছিল। তার অসুখের গল্প বলি শোন। পনের দিন তার দাঁত খোলেনি। ডাক্তার কেলি নাক দিয়ে আহার করাতেন। তার শ্বশুরবাড়ি কলকাতা থেকে আমার তখন হাওড়ার বাসায় তাকে নিয়ে যাওয়া ভারি কষ্টকর হয়েছিল। আমি ভৌতিক চিকিৎসাও করিয়েছিলাম, কিন্তু তারা হিস্টিরিয়া বলেছিল।

ওপরের এই আলোচনা দুটি থেকে দেখা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র ভূত-প্রেতে রীতিমতোই বিশ্বাসী ছিলেন। আর শুধু বিশ্বাসীই নয়, তাঁর জীবনে দু-দু বার দুটি ভৌতিক ঘটনাও ঘটেছিল সেই দুটি এই:

১.

বঙ্কিমচন্দ্র তখন মেদিনীপুর জেলায় নেগুয়া (বর্তমান কাঁথি) মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেই সময় তিনি কার্যোপলক্ষে একদিন ওই মহকুমার একজায়গায় যান। সেখানে রাত্রে তিনি যে বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়িতে নাকি এক প্রেতিনী দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন। তাঁর এই ভৌতিক অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি তাঁর দৌহিত্রদের কাছে অনেকবার বলেছিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাহিনীটিকে লিখে ছাপিয়ে ছিলেন।)

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই প্রেতিনীদর্শনের কাহিনী "বঙ্গদর্শন" প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও বলেছিলেন। পরে রামবাবুর কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রামবাসী কাঁঠালপাড়ার অনেকেও আবার শোনেন। রামবাবুর কাছে শোনা কাঁঠালপাড়ার প্রাচীন ব্যক্তিরা আজও এই কাহিনীটিকে বলে থাকেন। কাঁঠালপাড়ার ৮২ বৎসর বয়স্ক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় একদিন আমাকে এই কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন।

২.

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বে কয়েকদিন ধরে তাঁর মৃতা প্রথমা স্ত্রীকে দেখতে পেতেন। একথা তিনি সজ্ঞানেই তাঁর তখনকার শুশ্রূষাকারীদের বলেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র একবার "নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী" নামে ভূত নিয়ে একটি রচনাও লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। শোনা যায়, এটি নাকি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য লিখেছিলেন। কিছুটা লিখেই তিনি মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করেন। ফলে লেখাটি আর সম্পূর্ণ হয়ে উঠেনি। এই লেখাটির মূলে ছিল নাকি পূর্বোক্ত নেগুয়া মহকুমার প্রেতিনী দর্শনের অভিজ্ঞতা।

বঙ্কিমচন্দ্র এই ভূত-বিষয়ক রচনাটি যতটা লিখেছিলেন সে পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায়। দেশবন্ধু তাঁর 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে "বঙ্কিম সংখ্যায়" ওই পাণ্ডুলিপিটির প্রতিলিপি মুদ্রিত করেছিলেন। আমরাও এখানে সেই পাণ্ডুলিপিটির লেখা মুদ্রিত করলাম।

নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী

"ভাল সারি, সত্য কথা বল দেখি' তোমার বিশ্বাস কি ; ভূত আছে?"

বরদা, ছোটো সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল সন্ধ্যার পর, টেবিলে দুই ভাই খাইতেছিল। একটু রোষ্ট মটন প্লেটে করিয়া ছুরিকাঁটা দিয়া তৎসহিত খেলা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল।

সারদা প্রথমে, উত্তর না করিয়া এক টুকরা রোস্টে উত্তম করিয়া মাস্টার্ড মাখাইয়া বদন মধ্যে প্রেরণ পূর্বক, আধখানা আলুকে তৎসহবাসে প্রেরণ করিয়া, একটু রুটি ভাঙ্গিয়া বাম হস্তে রক্ষা পূর্বক, অগ্রজের মুখপানে চাহিতে চাহিতে চর্বণ কার্য সমাপন করিল। পরে, এতটুকু সেরি দিয়া, গলাটা ভিজাইয়া লইয়া বলিল, "ভূত? না।"

এই বলিয়া সারদাকৃষ্ণ সেন পরলোকগত এবং সুসিদ্ধ মেষ-শাবকের অবশিষ্টাংশকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

বরদাকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিল "rather laconic".

সারদাকৃষ্ণের রসনার সহিত রসাল মেষমাংসের পুনরালাপ হইতেছিল, অতএব সহসা উত্তর করিল না। যথাবিহিত সময়ে অবসর প্রাপনান্তর তিনি বলিলেন, "Laconic? বরং একটা কথা বেশি বলিয়াছি। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে ভূত আছে? আমার বলিলেই হইত "না।"। আমি বলিয়াছি, "ভূত ; না।" "ভূত" কথাটা বেশি বলিয়াছি। কেবল তোমার খাতিরে।

"অতএব তোমার ভ্রাতৃভক্তির পুরস্কার স্বরূপ, এই স্বর্গপ্রাপ্ত চতুষ্পদের খণ্ডান্তর প্রসাদ দেওয়া গেল।" এই বলিয়া বরদা, আর কিছু মটন কাটিয়া ভ্রাতার প্লেটে ফেলিয়া দিলেন। সারদা অবিচলিতচিত্তে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিল।

তখন বরদা বলিল, "Seriously সারদা, ভূত আছে বিশ্বাস করো না?"

সারদা : না।

বরদা : কেন বিশ্বাস করো না?

সারদা : সেই প্রাচীন ঋষির কথা। প্রমাণাভাবাৎ। কপিল প্রমাণ অভাবে ঈশ্বর মানিলেন না, আর আমি প্রমাণ অভাবে ভূত মানিব?

এই বলিয়া সারদা এক গেলাস সেরি মেষের সৎকারার্থ আপনার উদর মধ্যে প্রেরণ করিল।

বরদাকৃষ্ণ চটিয়া উঠিল। বলিল, 'কোথাকার বাঁদর? ভূত নাই! ঈশ্বর নাই! তবে তুমিও নেই, আমিও নেই?"

সারদা : তাই বটে। তোমার মটন রোস্ট ফুরাইল দেখিয়া, আমি নেই। আর আমার আহারের ঘটা দেখিয়া, বোধ হয় তুমিও নেই।

বরদা : 'কই, খেলি কই?" এই বলিয়া অবশিষ্ট মাংসটুকু কাটিয়া ভাইয়ের প্লেটে সংস্থাপিত করিয়া, গ্লাসে সেরি ঢালিয়া দিলেন। সারদা যতক্ষণ মাংসের ছেদন, বিন্ধন, মুখে উত্তোলন, এবং চর্বণ ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত, ততক্ষণ বরদা চুপ করিয়া রহিল। পরে অবসর পাইলে, সারদা জ্যেষ্ঠকে বলিল, তুমি নাই আর আমি নাই— ইহা প্রায় philosophically true— কেন না, আমরা "mere permanent possibilities of sensation." আর এই যে আহার করিলাম, ইহাও না করার মধ্যে জানিবে, কেবল সেই possible sensation-গুলির মধ্যে কতকগুলি sensation হইল মাত্র।
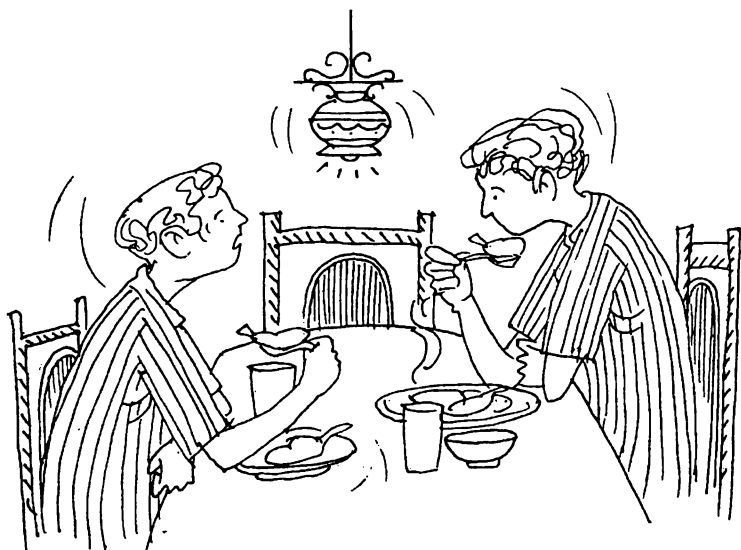
বরদা : সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি; ভূত দেখা, ভূতের শব্দ শোনা, এ সব possible sensation নহে?

সারদা : ভূত থাকিলে possible.

বরদা : ভূত নাই?

সারদা : তা ঠিক বলিতেছি না, তবে প্রমাণ নাই বলিয়া ভূতে বিশ্বাস নাই, ইহাই বলিয়াছি।

বরদা : প্রত্যক্ষ কি প্রমাণ নহে?

সারদা : আমি কখন ভূত প্রত্যক্ষ করি নাই।

বরদা : টেমস্ নদী প্রত্যক্ষ করিয়াছ?

সারদা : না।

বরদা : টেমস্ নদী আছে মান?

সারদা : যাহাদের কথায় বিশ্বাস করা যায়, এমন অনেক লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

বরদা : ভূতও এমন লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

সারদা : বিশ্বাসযোগ্য এমন কে? একজনের নাম করো দেখি?

বরদা : মনে করো আমি।

এই কথা বলিতে বরদার মুখ কালো হইয়া গেল— শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

সারদা : তুমি?

বরদা : তা হইলে বিশ্বাস করো?

সারদা : তুমি একটু imaginative, একটু sentimental— রজ্জুকে সর্প ভ্রম হইতে পারে।

বরদা : তুমি দেখিবে?

সারদা : দেখিব না কেন?

বরদা : আচ্ছা, তবে আহার সমাপ্ত করা হউক।

নারায়ণ,
বৈশাখ ১৩২২ পরিশিষ্ট

রাজনারায়ণ বর্ণিত ভৌতিক কাহিনী

কবি নবীনচন্দ্র সেন একসময় অসুস্থ হয়ে, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বৈদনাথে গিয়ে কিছুদিন বাস করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু তখন বৈদ্যনাথে থাকতেন।

নবীনচন্দ্রের বৈদ্যনাথের বাড়িতে সেই সময় কয়েকদিন ধরে ভূতের উৎপাত হয়। ভৌতিক উৎপাত মিটে গেলে নবীনচন্দ্র একদিন রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যান। সেদিন সেই ভৌতিক প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁদের উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র তাঁর "আমার জীবন" নামক আত্ম-জীবনীতে এইরূপ লিখে গেছেন :

বৈদ্যনাথে অনেকে এ ঘটনার কথা শুনিয়াছিলেন। ইহার দুই একদিন পরে ঋষিতুল্য পূজনীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার বাড়িতে নাকি একটা উৎপাত হইয়াছিল?

আমি বলিলাম—আপনি কি তাহা বিশ্বাস করিবেন? আমি ত এতদিন করি নাই।

তিনি বলিলেন—আমি বিশ্বাস করি। আমার বাড়িতেও ঠিক এরূপ একটি ঘটনা হইয়াছিল—তিনি তাহার বৃত্তান্ত 'মিরর' কী কোন্ কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলেন, বলিলেন।

ঘটনাটি এইরূপ :

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও একজন আত্মীয় বড় বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা দুজনে বরাবর পরলোকের কথা লইয়া তর্ক করিতেন, এবং দুজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যিনি আগে মরিবেন, পরকাল থাকিলে তিনি অপরকে যে প্রকারে হউক, তাহার প্রমাণ দিবেন। এখন বিধাতার ইচ্ছায় তাহার কিছুদিন পরে আত্মীয়টির মৃত্যু হয়। যে বাড়ি মহারাজা সূর্যকান্ত কিনিয়াছেন, রাজনারায়ণ তখন সেই বাড়িতে ছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহার ঘরে হঠাৎ কী এক অজ্ঞাত ফল পড়িতে লাগিল। চৌকি পাহারা দিয়া কিছুই হইল না। দেওঘরের সব ডিঃ অফিসারকে সংবাদ দিলে তিনি পুলিশ পাহারা দিলেন, কিন্তু কিছুতে উপদ্রব নিবারণ হইল না। কোথা হইতে ফল কীরূপে পড়ে, কিছুই বুঝা গেল না। একদিন হল-ঘরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, এমন সময় 'টুক্' করিয়া একটি ফল তাঁহার সম্মুখের টেবিলে পড়িল। সেদিন হঠাৎ তাঁহার সেই আত্মীয়ের প্রতিশ্রুতির কথা, যাহা তাঁহার পুত্র হইতে শুনিয়াছিলেন, মনে পড়িল। তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,— হাঁ হে, তুই কি অমুক? তুই সেই

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলি, তাই কী এরূপে ফল ফেলিতেছিস্? তাহা যদি হয়, কই, আর একটি ফল ফেল্ দেখি?

তখনই টুক করিয়া আর একটি ফল পড়িল।

তখন তিনি বলিলেন— বটে। আচ্ছা, বুঝা গেল। তুই এখন তোর সদগতি দেখ্। আর এ উপদ্রব করিস্ না।

তাহার পর হইতে আর সে উপদ্রব হয় নাই।

চক্রে দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র

দীনবন্ধু মিত্র এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এঁরাও পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন এবং মৃত ব্যক্তির আত্মার সহিত আলাপ করবার জন্য কখনো কখনো চক্রেও বসতেন। এঁদের এই চক্রে বসার কাহিনী বলবার পূর্বে চক্রে বসবার নিয়ম প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলছি।

পরলোকবাদীরা মৃতব্যক্তির আত্মার সহিত কথাবার্তা ও ভাবের আদানপ্রদানের জন্য চক্রে বসবার ব্যবস্থা করেছেন। এই চক্রে বসবাস নিয়মপ্রণালী সম্বন্ধে এরা বলেন :

একটা টেবিলের চারিদিকে চক্রাকারে বসতে হয়। দুই থেকে দশ পর্যন্ত চক্রে বসবার নিয়ম। যাঁরা চক্রে বসবেন, তাঁদের মধ্যে অর্ধেক স্ত্রীলোক হ'লেও ভালো হয়। চক্রে পরস্পর হাত স্পর্শ করে বসতে হয়, অর্থাৎ একজনের ডান হাতের পাঁচটা আঙ্গুলের পাশের লোকের বাঁ হাতের পাঁচটা আঙ্গুল যেন স্পর্শ করে থাকে। আঙ্গুলগুলির উপর যেন চাপ না পড়ে।

অনেকে আবার পরস্পর হাত স্পর্শ করে না ব'সে, দুহাতে চক্রের টেবিল স্পর্শ করেও বসে।

যার ঈশ্বরে কিংবা পরলোকে বিশ্বাস নেই, কিংবা যার মন কুভাবে কলুষিত, তাকে চক্রে বসতে দেওয়া উচিত নয়। চক্রে উপস্থিত সকলেরই একমনে ভগবানের নাম কীর্তন বা স্তোত্র পাঠ কর্তব্য। কীর্তন বা স্তোত্র পাঠের পর কেউ ইচ্ছা করলে, তার কোনো মৃত আত্মীয়ের আত্মাকে আহ্বান করতে পারে। তখন মৃত ব্যক্তি আত্মা চক্রে উপস্থিত কারও উপর ভর করবে।

যার উপর আত্মার ভর হবে, তার নিশ্বাস ঘন ঘন বইতে থাকবে, দেহে অবসাদ ভাব আসবে এবং হাত কাঁপতে থাকবে। ক্রমে এই সব লক্ষণ বৃদ্ধি পাবে এবং চেতনাও লোপ পেতে থাকবে। এইরূপ হ'লে বুঝা যাবে যে, তার উপর আত্মার আবির্ভাব হয়েছে।

যার উপর আত্মার আবির্ভাব হয়, তাকে মিডিয়ম বলে। মিডিয়মের উপর আত্মার সম্পূর্ণ ভর হয়েছে বুঝা গেলে তাকে প্রশ্ন করতে হবে। মিডিয়মের লিখবার ইচ্ছা হচ্ছে বুঝতে পারলে, পেন্সিল, শ্লেট বা কাগজ, কলম দিতে হবে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিডিয়মের দেহে অবসাদ ভাব ও চেতনার লোপ নাও হতে পারে। আত্মা এলে সে নিজেই চক্রের টেবিল নাড়া দিয়ে, এসেছে, একথা জানিয়ে দেয়। তখন আত্মাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, চক্রে এক দুই করে নম্বরে বসা ব্যক্তিদের মধ্যে কে মিডিয়ম হবে, টেবিলে ততটা শব্দ করে জানিয়ে দাও। তখন আত্মা টেবিলে য'টা শব্দ করবে, সেই শব্দ সংখ্যা অনুযায়ী, চক্রে তত নম্বরে বসা ব্যক্তি মিডিয়ম হবে। সেই মিডিয়মের তখন কিন্তু চেতনার লোপ হয় না। সে সজ্ঞানেই থাকে।

পরলোকবাদীরা আরও বলেন :
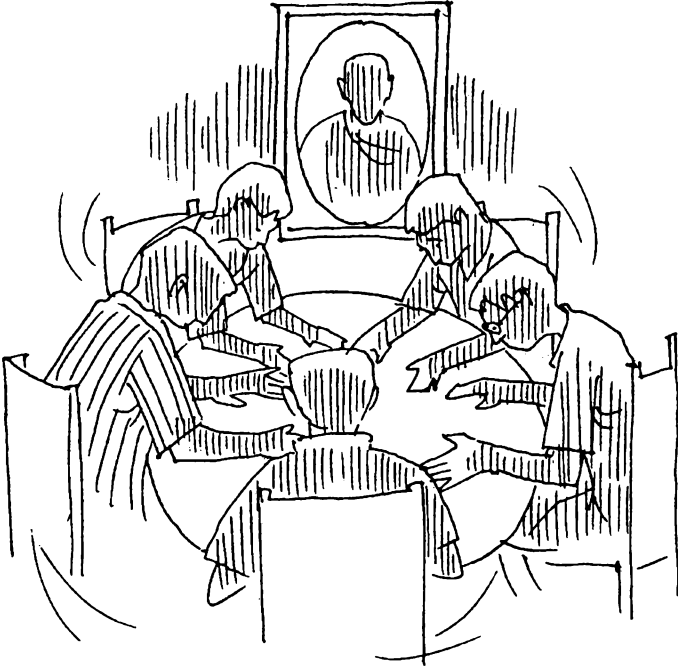
এমন সময়ে বা এমন স্থানে চক্রে বসা আবশ্যক যে, মন যেন বেশ আনন্দিত ও পবিত্র হয়। অতিশয় শীত বা অতি গ্রীষ্মের সময় কিংবা ঝড়বৃষ্টির সময় চক্রে বসা উচিত নয়। নাতিশীত বা নাতিগ্রীষ্মের সময় সকালে, বিকালে বা সন্ধ্যায় চক্রে বসবার উপযুক্ত সময়। ঠিক দুপুরে বা গভীর রাত্রিতে ভূত-প্রেতের আবির্ভাব বেশি হয়। উচ্চস্তরের মুক্তাত্মারা সে সময় ইহ জগতের মধ্যে আসেন না। সপ্তাহে দুই কিংবা তিনদিন চক্রে বসলে ভালো হয়।

যে ঘরে চক্রে বসা হবে, সে ঘর ঠাকুর ঘরের ন্যায় ব্যবহার করতে হবে। সে ঘর সাধারণ কাজের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। চক্রে বসবার পূর্বে ঘরটিতে ধূপধুনো জ্বেলে সুগন্ধি ফুল রাখতে হবে। চক্রে বসবার সময় ঘরটি একেবারে অন্ধকার করতে হবে অথবা একটু দূরে মৃদু আলো জ্বেলে রাখতে হবে। বসবার পূর্বে ঘরের জানলা দরজা ভিতর থেকে এমন ভাবে বন্ধ করতে হবে যে, বাইরে থেকে কেউ যেন না ঘরে ঢুকতে পারে।

উচ্চস্তরের পবিত্র মুক্তাত্মার আবির্ভাব হলে, অন্ধকার ঘরের মধ্যেও তাঁর জ্যোতি ফুটে উঠে এবং উপস্থিত সকলেরই মনে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। আর যে মিডিয়মের উপর ভর হয়, তার চেতনা শক্তি একেবারে লোপ পায়। চেহারার পরিবর্তন ঘটে, মুখশ্রী জ্যোতির্ময় ও আনন্দপ্রদ হয়, এবং কন্ঠস্বর ও হাবভাব এরূপ পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, মনে হয়, মৃত ব্যক্তি যেন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কথাবার্তা বলছেন। মুক্তাত্মা চলে যাওয়া মাত্র, সেই সঙ্গে জ্যোতি ও আনন্দের ধারা সমস্তই অন্তর্হিত হয়ে যায়। আবার নিম্নতরস্থ প্রেতাত্মার ভর হ'লে মিডিয়ম হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার ক'রে শেষে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে। তখন তার কষ্টের এক শেষ হতে থাকে। ওই সময় দুষ্ট প্রেতাত্মাকে তাড়াবার জন্য ভগবানের নাম করতে হয়। তাতে প্রেতাত্মা ছেড়ে না গেলে মিডিয়মকে ঘরের বাইরে খোলা বাতাসে এনে তার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে আবেশ ভাব কাটিয়ে দিতে হয়।

এই গেল চক্র এবং চক্রে বসবার নিয়ম প্রণালী সম্বন্ধে পরলোকবাদীদের কথা। এবার দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্রের চক্রে বসবার কাহিনীটি বলছি :

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর সম্পাদিত "হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের" প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় লিখেছেন—একবার তিনি যশোহরে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদ্বয় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাবর্ডিনেট জজ গিরিশচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, ম্যাজিস্ট্রেটের হেড্ ক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে চক্রে বসেছিলেন। চক্রে বসবার কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, দীনবন্ধু টেবিলের উপর তাঁর হস্তদ্বয় পরিচালনা করছেন। মনে হ'ল, তিনি যেন কিছু লিখবার চেষ্টা করছেন। দীনবন্ধুর এই ভাব দেখে, রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি কারও কারও মনে হতে লাগল, হয়ত দীনবন্ধু চতুরতা করছেন। তাই তাঁরা এই বিষয় নিয়ে একটু ঠাট্টা তামাসাও করতে লাগলেন।

শিশিরবাবু ইতিপূর্বে তাঁদের পারিবারিক চক্রে একাধিক বার বসেছিলেন। তাই এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। কারও উপর আত্মার আবির্ভাব হলে তাঁর দেহে কীরূপ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, তা তিনি জানতেন। দীনবন্ধুর হাবভাব দেখে

তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে, তাঁর উপর প্রকৃতই কোনো আত্মার ভর হয়েছে তখন শিশিরবাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতিকে মৃদু তিরস্কার করলেন এবং শেষে মিডিয়মের হাতে একটা পেনসিল দিয়ে, টেবিলের উপর একটা কাগজ রাখলেন। মিডিয়ম তৎক্ষণাৎ কাগজের উপর হিজিবিজি কাটতে আরম্ভ করলেন। তারপর হঠাৎ অস্পষ্টভাবে 'কুড়ন সরকার' কথাটি লিখলেন। উপস্থিত কেউই এই লেখার অর্থ বুঝতে পারলেন না। কিছুপরে দীনবন্ধুর আবিষ্ট ভাব কেটে গেল। সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে তিনি হিজিবিজি কাটা কাগজটা দেখতে গেলেন, এবং হিজিবিজির মধ্যে 'কুড়ন সরকার' লেখাটি দেখতে পেলেন। তিনি এই দেখেই বলে উঠলেন, কুড়ন সরকার যে আমাদের বাড়ির গোমস্তা ছিলেন। তিনি ত অনেক দিন আগে মারা গেছেন। তাঁর নাম হঠাৎ লেখা হ'ল কেন? তাঁর কথা ত বহুকাল আমি ভাবিই নি।

আর একদিন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, যশোহর স্কুলের হেড্মাস্টার উমাচরণ দাস প্রভৃতি কয়েকজন চক্রে বসেছিলেন। গিরিশবাবুর উপর আত্মার ভর হ'ল। তাঁর হাতে পেনসিল দেওয়া মাত্র তিনি দাগ কেটে কতকগুলি কাগজ নষ্ট করলেন। শেষে মিলটনের নাম লেখা হ'ল। তখন তাঁকে একটি ল্যাটিন কবিতা লিখতে অনুরোধ করা হ'ল।

অনেকক্ষণ ধরে মিডিয়মের ডান হাত দ্বারা টেবিলের উপর সজোরে ঠক্ ঠক্ করে আঘাত হতে লাগল এবং ক্রমে হাত অবশ হয়ে পড়ল। তারপর দ্রুতগতিতে ল্যাটিন ভাষায় একটি কবিতা লেখা হ'ল। উপস্থিত কেউই ল্যাটিন ভাষা জানতেন না। কিন্তু সেই সময় বিভাগীয় স্কুল ইন্স্পেক্টর সুপণ্ডিত ক্লার্ক সাহেব কার্যোপলক্ষে যশোহরে গিয়েছিলেন। তাঁকে ওই লেখাটি দেখানো হলে তিনি সেটি পাঠ করে বললেন— এটি একটি অসম্পূর্ণ ল্যাটিন কবিতা।

প্রেততত্ত্ববিদ প্যারীচাঁদ

"আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাসের লেখক বিখ্যাত টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্র একজন খ্যাতনামা প্রেততত্ত্ববিদ ছিলেন। পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি একাধিক গ্রন্থ ও রচনা করে গেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর দুটি বই হচ্ছে— 'অন্ দি সোল', '(On the Soul)' এবং 'স্ট্রে থট্স অন্ স্পিরিচুয়ালিজম্' '(Stray thoughts on Spiritualism)'।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী মারা যান। ওই ঘটনার পর থেকেই তিনি পরলোক বিদ্যার চর্চা আরম্ভ করেন। ২৯। ১২। ৮১ তারিখে "ইন্ডিয়ান মিরর" পত্রে প্যারীচাঁদ মিত্র নিজেই লিখেছিলেন— আমার স্ত্রীর পরলোকগমনের পর থেকে আমি আধ্যাত্মিক চর্চা করে আসছি।

প্যারীচাঁদ অনেক দিন কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক ছিলেন। ওই সময় লাইব্রেরিতে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে যেসব বই ছিল, সে সমস্তই তিনি মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন। প্যারীচাঁদ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার বিখ্যাত অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিত জজ, ডব্লিউ এড্মন্ড সাহেবের কাছে চিঠি লিখে পরলোক সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় জেনে নেন। এড্মন্ড সাহেব ছাড়া ওই সময় তিনি জেম্স বার্ণস, জে. জে. মোর্স, মিসেস্ ইমা এইচ্, ব্রিটেন প্রভৃতি পরলোকতত্ত্ববাদীদের সঙ্গে ও পত্র ব্যবহার করতেন।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ডা. বেরিগ্ণী নামে একজন ফরাসি হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসক অস্ট্রেলিয়া থেকে কলকাতায় আসেন। অনেকে বলেন যে, তিনিই এদেশে প্রথম হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রচলন করেন। বেরিগ্ণী সাহেবের অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়েও বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। এঁর সংসর্গে এসে সেকালে অনেক শিক্ষিত বাঙালি যুবক হোমিওপ্যাথি এবং আধ্যাত্মিক, এই দুই বিষয়ের চর্চা আরম্ভ করেছিলেন। প্যারীচাঁদও এই বেরিগ্ণী সাহেবের বাড়িতে অধ্যাত্মবিদ্যা চর্চা করতে যেতেন। বেরিগ্ণী সাহেবের বাড়িতেই তিনি আরও কয়েকজনের সহিত সর্বপ্রথম চক্র করে বসতে শুরু করেন। প্যারীচাঁদ নিজেও লিখেছেন যে, তাঁরা নিয়ম মতো এই চক্রে বসতেন এবং এই চক্রে বসেই তিনি প্রথমে মিডিয়ম হন।

আমেরিকার ডা. জে. এম. পিবল্স এম. এ. এম. ডি. পি. এইচ্. ডি নামে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি একজন খ্যাতনামা প্রেততত্ত্ববিদও ছিলেন। পরলৌকিক

বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য ডাঃ পিবলস পাঁচ পাঁচবার পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন। এই ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে তিনি ফাইভ্ জার্নিস এরাউন্ড দি ওয়ার্লড (Five journeys around the world) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

ডা. পিবল্‌স তাঁর পৃথিবী ভ্রমণের পথে পাঁচ বারই ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তবে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন মাত্র দুবার। তিনি প্রথমবার কলকাতায় আসেন ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। প্যারীচাঁদ মিত্র ওই সময় কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিউজেন্স সাহেবের অফিস বাড়িতে প্রতি রবিবারে পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করতেন ও চক্রে বসতেন। এই মিউজেন্স সাহেব ছিলেন কলকাতার মরাণ-কোম্পানির অফিসের কর্মাধ্যক্ষ। ৩নং চার্চ লেনে তাঁদের কোম্পানির অফিস ছিল।

ডা. পিবল্‌স ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে যেবার কলকাতায় আসেন, সেই বৎসর তিনি স্বদেশে ফিরে ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে সেখানকার স্পিরিচুয়াল ইন্সটিটিউটে একটি বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন— কলকাতায় গিয়ে সবার আগে কেশবচন্দ্র সেনের সহিত আলাপ পরিচয় হয়। সেই সময় "মিডিয়ম এন্ড ডেব্রেক" নামক পরলৌকিকতত্ত্ব বিষয়ক সংবাদপত্রের সম্পাদক মি. বার্ণস এবং সম্ভবত আরও কয়েকজন পরলোকবাদীর সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়েছিল। পরলৌকিকতত্ত্বের আলোচনার দ্বারা আমাদের কুসংস্কার দূরীভূত হবে, এই বিশ্বাসে কেশবচন্দ্র সেন এই সম্বন্ধে চর্চা করতে পছন্দ করতেন।

ডা. পিবল্‌স প্যারীচাঁদ সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ— তাঁর সহিত পূর্ব হতেই আমার পত্র ব্যবহার চলছিল। এইবার কলকাতায় গিয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি একজন সুবিখ্যাত পরলোক-তত্ত্ববাদী এবং নিজে ভালো মিডিয়ম। প্রথমে আবিষ্ট অবস্থায় তিনি লিখতেন। ক্রমে সূক্ষ্ম দর্শনের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। তিনি শেষে তাঁর পরলোকগতা স্ত্রীর উপস্থিতি বেশ অনুভব করতেন এবং তাঁর মনে হত ঠিক যেন তিনি সশরীরে তাঁর নিকটে রয়েছেন।

একদিন প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে বসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছি, এমন সময় তাঁর এক বন্ধু সেখানে এলেন। তাঁর নাম শিবচন্দ্র দেব। তিনিও একজন পরলোকবাদী। জানলাম ডেভিড, টাটলস্, সার্জেন্ট, ডেল্টন, জর্জ এড্‌মণ্ড প্রভৃতি আমেরিকার সুবিখ্যাত আধ্যাত্মবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণের গ্রন্থাদি তিনি পাঠ করেছেন এবং বাংলা ভাষায় পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে যে একখানি পুস্তক রচনা করেছেন, তাতে উল্লিখিত গ্রন্থাদি হতে অনেক বিষয় উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর এই পুস্তক একখানি তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

ডা. পিবস্‌স উল্লিখিত এই শিবচন্দ্র দেব ছিলেন, প্যারীচাঁদ মিত্রের বৈবাহিক। এঁর বাড়ি ছিল হুগলি জেলার কোন্নগরে। শিবচন্দ্রের তৃতীয় কন্যার সহিত প্যারীচাঁদের দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ হয়েছিল।

মৃণালকান্তি ঘোষ তাঁর "পরলোকের কথা" গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই শিবচন্দ্র দেবের দ্বিতীয়া কন্যার হঠাৎ মৃত্যু হলে, তাঁর আত্মা প্যারীচাঁদের নিকট এসে বলেন— আপনি এখনি কোন্নগরে চলুন। আমার মা শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন।

প্যারীচাঁদ তৎক্ষণাৎ কোন্নগরে যান। সেখানে গিয়ে দেখলেন, বৈবাহিকের একটি কন্যার মৃত্যু হয়েছে। তিনি শিবচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে চক্রে বসলেন। শিবচন্দ্রের স্ত্রী মিডিয়ম হয়ে আবিষ্ট অবস্থায় লেখেন— মা, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা করো। আমি অনেক যন্ত্রণা ভোগ করে এখন বেশ শান্তিতে আছি।

এইরূপ আরও অনেক কথা লেখবার পর শিবচন্দ্রের স্ত্রীর আবেশ ভেঙে গেল। তখন তিনি আবার কন্যার জন্য কাঁদতে লাগলেন।

প্যারীচাঁদ তাঁকে এই কথা বুঝালেন— আপনার কন্যা এ জগতে অনেক কষ্ট পাচ্ছিল, এখন সে বেশ সুখ শান্তিতে আছে। কাজেই তার জন্য শোক করা উচিত নয়। এতে তাকে দুঃখ দেওয়া হবে।

সেই থেকে শিবচন্দ্রের স্ত্রীর মেয়ের জন্য শোক অনেক কমে গিয়েছিল।

আমেরিকার বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ্‌রা প্যারীচাঁদকে কীরূপে সম্মান করতেন, এখানে সে সম্বন্ধে আর একটি কথা বলছি :

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে থিওসফিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার কিছুকাল পরে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন তারিখে ওই সোসাইটির সভাপতি অলকট সাহেব প্যারীচাঁদ মিত্রকে একটি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রে তিনি লেখেন :

মাননীয় মহাশয়, আমেরিকার সমুদয় মণীষা-সম্পন্ন প্রেততত্ত্ববিদদিগের নিকট আপনার নাম অতি সুপরিচিত। আমি স্বয়ং আপনার গভীর চিন্তার কথা মিসেস্ ইমা, এইচ্, ব্রিটেন (ইনি আমাদের সোসাইটির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্যা) ও জে. এম. পিবল্‌স এর কাছে শুনেছি। লন্ডন শহর থেকে প্রকাশিত স্পিরিচুয়ালিস্ট সাময়িকে আপনার লেখা প্রবন্ধ সকল আমি পড়েছি। ২৫ মে তারিখ সংখ্যায় আলেকজাণ্ডার ক্যালভার সাহেব আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে আপনার অভিমত প্রকাশ করেছেন। ওই মত আমাদের ভক্তিভাজন সহকর্মী ও উপদেষ্টা ম্যাডাম এইচ্. পি. ব্লাভাট্‌স্কির মতের সহিত এত ঐক্য হয়েছে যে, আমাদের কাউন্‌সেল আমাকে আদেশ করেছেন যে, করেসপন্‌ডিং ফেলোদিগের মধ্যে আপনার নাম লিপিবদ্ধ করবার জন্য আপনাকে বিনয় সহকারে অনুরোধ করা হউক।

আপনার বাসস্থান এখান হতে অত্যন্ত দূর ও চিঠিপত্রাদিও আদানপ্রদান করতে কালবিলম্ব হবে ব'লে আপনার নিকট হতে উত্তর প্রাপ্তির অপেক্ষা না ক'রে, আপনার ডিপ্লোমা এই পত্রের সহিত প্রেরণ করতে সাহসী হয়েছি, এবং ভরসা করি আপনি এই ডিপ্লোমা, রেখে দেবেন।

এই সময় থেকে প্যারীচাঁদ যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি বরাবর অলকট সাহেব ও ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কির সহিত নানা বিষয়ে পত্র বিনিময় করতেন।

অলকট সাহেব ও ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি পরে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এঁরা কলকাতায় এসে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ৭ এপ্রিল তারিখে কলকাতায় থিওসফিক্যাল সোসাইটির কলকাতা শাখা সভ্য স্থাপন করলে, প্যারীচাঁদকে তাঁরা সভাপতি নির্বাচিত করেছিলেন। সে সময় কলকাতা থিওসফিক্যাল সোসাইটির কাজ ২নং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিটে, ইন্ডিয়ান মিরর অফিসে হত এবং প্রতি পনেরো দিন অন্তর সভার অধিবেশন বসত।

শিশিরকুমারের ভূত দর্শন

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক, অমিয় নিমাই চরিত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা, পরম বৈষ্ণব মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ অনেক সময় সপরিবারে বৈদ্যনাথ-দেওঘরে গিয়ে বাস করতেন। একবার শিশিরবাবুর দেওঘরে থাকবার সময় সেখানে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে ছিল। শিশিরবাবু সেই ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখে তাঁর সম্পাদিত 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল' ম্যাগাজিনের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলেন। সেই ঘটনাটি শিশিরবাবু এইরূপ লিখেছেন :

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে দেওঘরে গিয়ে নিজের বাড়িতে বাস করছিলাম। আমার বাড়ির কাছেই গণেরী মাহাতা নামে এক গয়লা বাস করত। গণেরীর বাড়িটা ছিল খোলা মাঠের মধ্যে।

একদিন আমি শুনলাম, গণেরীর বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হচ্ছে। এই কথা শুনবার পরেই গণেরীর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। আমি তখন তাকে ভূতের কথা জিজ্ঞাসা করায়, উত্তরে সে বললে— আজ্ঞে, সে একটা পিশাচ।

গণেরী আমাকে দুধ যোগান দিত। আমার উড়ে চাকর শিবে প্রতিদিন গিয়ে দুধ আনত। শিবে এইরূপে একদিন যায়। কিন্তু সেদিন গণেরীর ক'টি বন্ধু শিবেকে অজ্ঞান অবস্থায় আমার বাড়িতে রেখে গেল। শিবের জ্ঞান ফিরলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম— কী হয়েছিল?

শিবে বললে— গণেরীর বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হয়েছে শুনে সন্ধ্যার আগেই আমি দুধ আনতে গিয়েছিলাম। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। দুধ নিয়ে আমিও গণেরীর বাড়ি ছেড়ে একটু এসেছি, এমন সময় কালো রংএর কিম্ভূতকিমাকার কী একটা লাফিয়ে আমার উপর পড়ল এবং আমার বুকে এমন একটা ধাক্কা মারল যে, আমি ভয়ে চিৎকার করে সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

পিশাচের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গণেরী সেদিন তার কয়েকজন বন্ধুকে সারারাত থাকবার অনুরোধ করে এসেছিল। সন্ধ্যার পূর্বেই গণেরীর ওই বন্ধুরা গণেরীর বাড়িতে এসেছিল। তারা শিবের চিৎকার শুনে দৌড়ে আসে এবং শিবের ওইরূপ অবস্থা দেখে তাকে ধরাধরি করে আমার বাড়িতে রেখে যায়।

পরের দিন সকালে আমি আমার দুজন বন্ধুসহ গণেরীর বাড়িতে গেলাম। যখন যাই, তখন গণেরী, তার বুড়ি মা এবং তার স্ত্রী কেহই বাড়িতে ছিল না। শুধু গণেরীর এগারো বারো বছরের একটি মেয়ে উঠান ঝাঁট দিচ্ছিল।

মেয়েটি একা ঝাঁট দিচ্ছে দেখে, আমরা বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

আমার বন্ধু দুটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিল। এই অবসরে আমি কৌতুকচ্ছলে ভূতকে সম্বোধন করে বললাম— ওহে ভূত মশায়, তুমি যদি এখানে থাক, অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে প্রকাশ হও।

এই কথা বলা মাত্রই আমার সম্মুখস্থ গণেরীর বাড়ির চালের উপর দিয়ে একতাল মাটি গড়িয়ে এসে আমার কাছে পড়ল।

এতে আমি বেশ আমোদ উপভোগ করলাম। আমি বন্ধুদের বললাম— দেখ, ভূত মশায় কেমন করে আমার অনুরোধ রক্ষা করলেন।

বন্ধুরা মাটির তাল পড়ার শব্দ শুনেছিলেন, কিন্তু সেটা পড়তে দেখেন নি। মাটির চাঙ্গড়টা পরীক্ষা করবার জন্য তাঁরা এবার আমার কাছে এলেন।

আমি আবার ভূতকে সম্বোধন করে বললাম— আমরা তিনজনেই তোমার অতিথি। আমাদের সকলের সম্বন্ধেই তোমার একরূপ ব্যবহার করা উচিত। তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করলে, কিন্তু আমার বন্ধুদের সন্তুষ্ট করলে না। কৃপা করে তাঁদের কাছেও প্রকাশ হও।

এই কথা বলা মাত্র আর একটা মাটির চাঙ্গড় গড়িয়ে এল। এবার আমরা তিনজনেই সেটা দেখতে পেলাম। এই ব্যাপার দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। ভাবলাম, এ কি ওই মেয়েটির কাজ? তাই বা কি করে হবে, কারণ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম, সে তখনও ঝাঁট দিতে ব্যস্ত।

আমি আবার বললাম— ভূত মশায়, দয়া করে আমাদের সকল সন্দেহ দূর করো।

অমনি তৎক্ষণাৎ একটা চাঙ্গড় এবং তারপরে সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটা চাঙ্গড় মাটি গড়িয়ে এল, আমরা অবাক হয়ে গেলাম। তখন বেলা প্রায় ৯টা। পরিষ্কার সূর্যালোকে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা তিনজনে এই দৃশ্য দেখলাম।

পিশাচ মশায় কিন্তু এই বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করবারও আমাদের অবসর দিল না। কৌতুক করেই যেন, সে মাটির সঙ্গে পাথরের চাঙ্গড় নিয়ে খেলা শুরু করে দিল। তখন আর অনুরোধের আবশ্যক হল না।

পরে দেখলাম উঠানের যে দিকে বালিকাটি ঝাঁট দিচ্ছিল, সে দিকেও ইট, পাথর ও মাটি পড়তে লাগল।

মুহূর্তের মধ্যেই এই অলৌকিক ঘটনার কথা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে লোক ছুটে এল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সে স্থানটা লোকে ভরে গেল।

একটু পরেই গণেরী, তার মা এবং তার স্ত্রী ফিরে এল। গণেরীর উঠোনের একধারে একটি পাতকুয়া ছিল। এই কুয়ার জলের মধ্যে ভূত মশায় তোলপাড় শব্দ করছিল। সেই দিকে লোকের দৃষ্টি পড়া মাত্র দেখা গেল, হঠাৎ ওই পাতকুয়ার ভিতর থেকে এক মণের অধিক ওজনের একটি প্রকাণ্ড পাথর প্রবল বেগে উঠে উঠানের মাঝখানে এসে পড়ল। সৌভাগ্যের বিষয় যে সেখানে কোনো লোক ছিল না।

এই ব্যাপার দেখে সকলেই ভয়ে চমকে উঠল। অনেকে ভয়ে পালাল।

সমস্ত দেখে আমার মনে হচ্ছিল, গণেরীর মেয়েটি মিডিয়ম অর্থাৎ তাকে আশ্রয় করেই প্রেতাত্মা এই সকল অলৌকিক কাণ্ড করছে। কেন না লক্ষ করে দেখলাম— বালিকাটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানেই ইট, পাথর বেশি পড়ছিল।

আমার এই ধারণা ঠিক কী না পরীক্ষা করবার জন্য সেই বালিকাটিকে ও গণেরীর স্ত্রীকে বাড়ির পূর্ব দিকের মাঠে নিয়ে গেলাম। ওই জমিতে সরিষার খেত ছিল। সরিষা গাছ তুলে নেওয়ায় মাঠটা খালি পড়েছিল। ওই মাঠটা মাটির চাঙ্গড়ে পূর্ণ ছিল। খুব সম্ভব ভূতটি এইখান থেকেই মাটি সংগ্রহ করছিল। আমি স্ত্রীলোক দুটিকে এই মাঠের মধ্যে বসিয়ে রাখলাম।

কী আশ্চর্য! তারা সেখানে বসা মাত্র তাদের চারিদিকে মাটির চাঙ্গড়গুলি যেন নাচ শুরু করে দিল। অর্থাৎ কখনও মাটির একটা চাঙ্গড় চার পাঁচ ফিট উপরে উঠছে, আবার তৎক্ষণাৎ জমিতে পড়ছে। কখন বা একসঙ্গে কয়েকটা উঠছে আবার পড়ছে। এইভাবে চাঙ্গড়গুলি উঠতে পড়তে লাগল।

তখন বেলা প্রায় এগারোটা। চারিদিকে লোক জমে গেছে। সেই সময় সকলের সামনে মাটির চাঙ্গড়গুলি ওইভাবে উঠতে পড়তে লাগল। দেখে মনে হল, চাঙ্গড়গুলি যেন জীবনীশক্তি পেয়েছে। ওদিকে গণেরীর বাড়িতে তখন কিন্তু মাটি পড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

এবার গণেরীর স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে আমি একটি ঘরের মধ্যে মুখোমুখি হয়ে বসলাম। বাইরে যেমন আলো, ঘরের মধ্যেও প্রায় তেমনিই আলো ছিল।

গণেরীর ঘরে আমার পিঠের দিকে একটা দড়ির সিকা টাঙানো ছিল। সেই সিকায় শালপাতার একটা দোনাতে কিছু ডাল ছিল। আমার পিছনে খস্ খস্ শব্দ শুনে ফিরে দেখি, সেই শালপাতার দোনা যেন সিকা থেকে বার হবার চেষ্টা করছে। তারপর পরিষ্কার দেখলাম, বেরিয়ে শূন্যে এসে ডালগুলি আমার মাথার উপর ঢেলে দিল। এই ঘটনাতে আমার একটা স্ফুর্তি হল বটে, কিন্তু একটু ভয়ও হল।

এরপর দেখলাম, একটা কাঠের বাটি আর একটা সিকা থেকে বেরিয়ে শূন্যপথে আমার দিকে আসতে লাগল। ওই বাটিতে নুন ছিল। ভূত মশায় আমার মাথায় বাটির নুন সব ঢেলে দিল।

ভূত মশায়ের এইরূপ কৌতুক দেখে ঘরের আমরা তিনজনেই হাসতে লাগলাম।

আমরা যে ঘরে বসেছিলাম, সেই ঘরের এক কোণে প্রায় এক মানুষ লম্বা একটা বাঁশের লাঠি ছিল একটু পরেই দেখলাম, লাঠিখানা হঠাৎ নড়ে উঠল তারপর লাঠিখানা আস্তে আস্তে লাফাতে লাফাতে আমার দিকে আসতে লাগল। মনে হল, কেউ যেন, দুহাত দিয়ে ওটা ধরে আমার দিকে আসছে। শেষে হঠাৎ মাটির উপর ভীষণ জোরের সঙ্গে আঘাত করল। আমার পরম সৌভাগ্য যে, মাত্র কয়েক ইঞ্চি ব্যবধানের জন্য আমার মাথাটা বেঁচে গেল। ওই লাঠিটা তখন যদি ওইরূপ জোরে আমার মাথায় পড়ত, আমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যেত যাইহোক্, তখন আমার মনে হ'ল, এখান থেকে শিগ্‌গির চলে যাবার ইঙ্গিত করেই পিশাচ মশায় আমাকে ওইরূপ ভয় দেখাচ্ছে। অগত্যা আমি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে সরে এলাম।

দীনেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পিতামহের অপমৃত্যু

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর "ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য" গ্রন্থে তাঁর জ্যেষ্ঠ পিতামহ রামনাথ সেনের অপমৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ লিখে গেছেন :

তিনি (রামনাথ) নানারূপ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান দ্বারা নিজে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের প্রয়াসী ছিলেন। এই প্রচেষ্টায় তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে তিনি তাঁহার বন্ধু স্বগ্রাম নিবাসী এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে গাজিখালী নদীর ধারে শব সাধনা করতে গিয়েছিলেন। রামনাথের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী গৌরমণি দেবী তখন অষ্টাদশ বর্ষীয়া। আমি তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাই লিখিতেছি। রামনাথের বন্ধুর নাম মনে পড়িতেছে না, কিন্তু তাঁহার পুত্র শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়কে আমি বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। *

গৌরমণি ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

তখন শীতকাল। কর্তা (রামনাথ) তাঁহার বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যাকালে বাহির হইয়া গেলেন। সেদিন শনিবার অমাবস্যা। কোথা হইতে দুইটি চণ্ডালের মৃতদেহ তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার উপর উপবিষ্ট হইয়া ইঁহারা সাধনা করিবেন।

আমাদের বাড়িতে অনেক লোকজন। খাওয়া শেষ করিতে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হইত। সেই রাত্রি তখন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। বাড়ির খাওয়া-দাওয়া তখনও শেষ হয় নাই। আমি বাড়ির বউ, খাওয়ার ডাক পড়ে নাই। আমি ঘোমটা টানিয়া উনুনের পাশে বসিয়া শীতকালের আগুন পোহাইতে ছিলাম। আমার বড়ই ঘুম পাইতেছিল, চক্ষে তন্দ্রা আসিয়াছিল। সেই তন্দ্রার ঘোরে স্পষ্ট দেখিলাম একটা কালো বুড়ি আমার কাছে একটা থলে হাতে করিয়া আসিল এবং থলেটার মুখ খুলিয়া আমার মাথার উপর ঝাড়িতে লাগিল এবং বলিল— আজ হ'তে পৃথিবীর যত দুঃখ, তা এই থলে শূন্য করে তোর মাথায় দিয়ে গেলাম।

---

* এই ঘটনা সম্বন্ধে গ্রামের সপ্তশিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ মদীয় খুল্লতাত দেবীচরণ দাশ মহাশয় লিখিয়াছেন— রামনাথ শ্মশান ক্ষেত্রে চিতায় বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন, প্রকাশ আছে, তিনি তপস্যায় স্খলিত হওয়াই মৃত্যুর কারণ সংঘটিত হইয়াছিল।

আমার তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া গেল। যেমনই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছি, অমনই বাড়িতে একটা ভয়ানক গোলমাল শুনিলাম। তারপর জানিলাম, আমার কপাল পুড়িয়াছে। লোকজনেরা একটা বাঁশের দোলায় আমার স্বামীকে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তিনি গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছেন। তাঁহার বামগণ্ডে ভয়ানক থাপ্পড়ের দাগ, পাঁচটা আঙ্গুলের আঘাত যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ঘাড়ের হাড় বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যেহেতু সমস্ত মুখখানি ডানদিকে বাঁকিয়া আছে।

এই অবস্থায় তিনি তিন দিন জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ শব্দ করিয়াছেন, কোনো জ্ঞান ছিল না। কোনো কথা বলিতে পারেন নাই। সকলেই বলিল— শবের উপর বসিয়া জপ করিতেছিলেন, ভূতের চড়ে এই দুর্দশা হইয়াছে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর পিতাও তাহাই বলিলেন।

পরলোকতত্ত্ব চর্চায় রবীন্দ্রনাথ

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার 'ওয়াশিংটন' নামক পত্রিকায় 'এডিসনের মেসিন' নামে একটি অভিনব যন্ত্রের সংবাদ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পরেও যে আত্মার অস্তিত্ব আছে, তা ওই যন্ত্রের সাহায্যে বুঝা যাবে— এই ছিল সংবাদটির বিষয়বস্তু।

এই ১৯২০ খ্রিস্টাব্দেই রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় যান। আমেরিকায় গিয়ে তিনি যখন সেখানে নানা স্থানে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন এক সময় মারগারী রেক্স নামে একজন আমেরিকান মহিলা, মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব আছে কিনা এবং ওই 'এডিসনের মেসিন' প্রসঙ্গ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন। রবীন্দ্রনাথ মারগারী রেক্সকে সেদিন বলেছিলেন— মৃত্যু আছে, তা সত্ত্বেও জীবন ফুরায় না।...মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে আমার আশা ও বিশ্বাসের শেষ নেই। তবে মানুষের কাছে তার প্রমাণের জন্য আমি কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন দেখি না। ধরা যাক, মেসিন সেই সত্তার কাছে কোনো খবর পৌঁছে দিতে পারল না, আমার কাছে তা হলেই তার অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয়ে যাবে না।

এই মারগারী রেক্স ছিলেন, আমেরিকার বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ্ স্যার অলিভার লজের শিষ্যা। আমেরিকায় শুধু মারগারী রেক্সই নন, স্বয়ং স্যার অলিভার লজও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরলোকতত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর "বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে লিখেছিলেন :

স্যার অলিভার লজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, আমরা জানি। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী। মৃত আত্মার সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান, প্ল্যানচেট কৌশল ইত্যাদিতে তাঁর বিশ্বাস, তিনি নানা প্রমাণ সহযোগে লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কি আলোচনা হয়েছিল, তা এখনও আমার গোচরে আসেনি। তবে দেখছি ১৯২৮ সালে "ষ্ট্রাফোর্ডশায়ার সেন্টিন্যাল" বলে একটি কাগজে স্যার অলিভার লজের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের উল্লেখ আছে। স্যার অলিভার নাকি একদা রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনারা কি ভারতবর্ষে টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন? কবি নাকি বিস্মিত হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন— বিশ্বাস করি! আমরা প্র্যাকটিস্ করি।

আমাদের মনে হয়, স্যার অলিভার লজ পরলোকতত্ত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করে, এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে কিছুটা প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেন না, দেখা যায় পরে রবীন্দ্রনাথ মৃত ব্যক্তির আত্মার সহিত ভাবের আদানপ্রদানের জন্য কিছুদিন ধরে চক্রে বসেছিলেন এবং প্ল্যানচেটেরও চর্চা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :
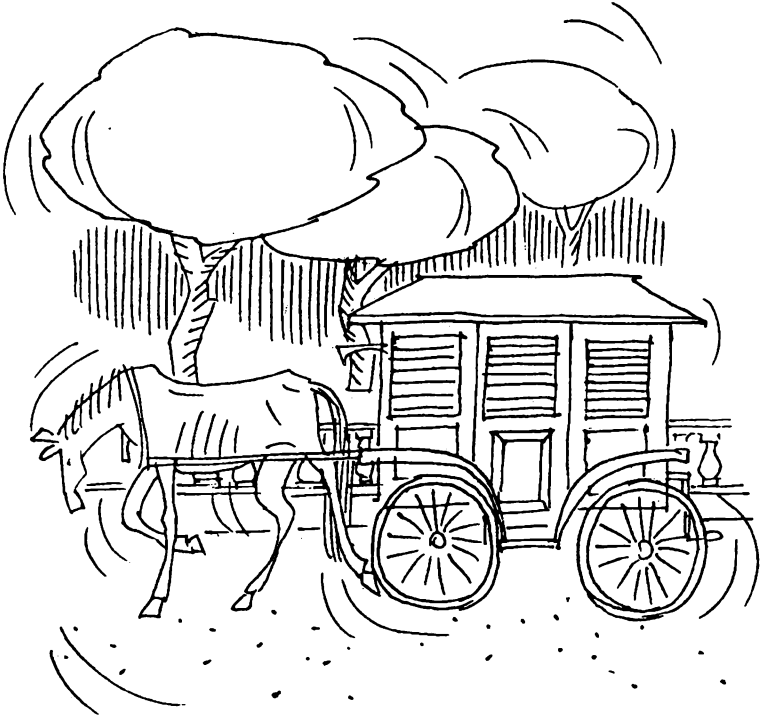
মাঝে মাঝে তাঁহাকে (রবীন্দ্রনাথকে) প্ল্যানচেট, মিডিয়ম প্রভৃতির আলোচনা করিতে দেখিলে একটু অবাক হইতে হয়। আলমোড়া হইতে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত একখানি পত্রের মধ্যে তিনি প্ল্যানচেটের কথা বলিতেছেন।— বৃদ্ধ বয়সে মোহিতচন্দ্র সেনের (শান্তিনিকেতনের এক সময়ের অধ্যাপক এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলী'র সম্পাদক) কন্যা উমা দেবীর মাধ্যমে (মিডিয়ম) যেসব কথার তিনি উত্তর পাইয়াছিলেন, তাহা অতীব আশ্চর্য ও কৌতুকপ্রদ।

প্রভাতবাবু উপরে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিটির কথা বলেছেন, সে চিঠিটিতে রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলি লিখেছিলেন, সেদিন প্ল্যানচেটে[১] হাত দেবামাত্র লেখা বেরুল বাবা মশায় অসুস্থ। জিজ্ঞাসা করলুম— আল্‌মোড়া থেকে আমাকে কোথায় গিয়ে স্থিতি করতে হবে। "বল্লে, কলকাতায়। বোলপুরে গিয়ে থাকতে পারব না শুনে বিস্মিত হলুম।

রবীন্দ্রনাথ একবার উমা দেবীকে নিয়ে চক্রে বসে তাঁর মাধ্যমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতির আত্মাকে এনেছিলেন এবং সেই আত্মাদের নানা প্রশ্ন করে অনেক কথাও জেনে নিয়েছিলেন। ওইদিনকার ওই চক্রে বসার কথা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এর কয়েকদিন পরেই শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে এক পত্র লিখেছিলেন। ওই পত্রে তিনি লেখেন :

> আমার আধুনিক লেখা পড়েছে কিনা প্রশ্ন করলুম, সত্যেন্দ্র বললে— পড়েছি কেমন করে বলি, কিন্তু প্রত্যেক লাইনটা জানি। আশ্চর্য!

শরৎ চাটুয্যের লেখার উপর তোমার শ্রদ্ধা আছে? উত্তর— পূর্বে ছিল, কিন্তু এখন ঠিক ধরতে পারিনি। হয়তো সে আমার দেহহীন আত্মারই দুর্ভাগ্য।

সত্যেন্দ্রর সব কথাই কারো লিখে রাখা উচিত ছিল। থাকলে দেখতে, তাতে ভাববার কথা খুবই আছে। আমার লক্ষ্মীছাড়া স্মৃতিশক্তি, মনে আনতে পারচি নে। সত্যেন্দ্রর পালা শেষ হবার মুখে সে বললে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেচেন। তাঁর সমস্ত কথা শুনে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছি।

মণিলাল, অজিত, সত্যেন সবাইকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি— তোমরা কি আনন্দ ভোগ কর?

সত্যেন্দ্র একটা প্রশ্নের চিহ্ন দিয়ে লিখলো, আনন্দ! তারপর বললে আনন্দ আমরা নিজের অন্তরেই সৃষ্টি করি। মণিলালও লিখেছিল, সুখ নয়, কিন্তু শান্তি। জ্যোতিদাদাকে প্রশ্ন করেছিলুম— দেহ নিতে ইচ্ছা হয়। তিনি বললেন— আমি ইচ্ছা করিনে, যারা সুখ চায়, তারাই ইচ্ছা করে।

আনন্দের কথায় তিনি বলেছিলেন অসীম শান্তি! কিন্তু?

১. প্ল্যানচেট কাঠ দিয়ে তৈরি দেখতে ঠিক পানের মতো। তলায় একদিকে দুটো ছোট চাকা আর অপরদিকে এমন একটা ছিদ্র থাকে যার, ভিতর দিয়ে কাঠের লেড পেনসিল শক্ত ও সমান করে লাগানো যেতে পারে। প্ল্যানচেট সামনে রেখে একজন কী দুজন দুহাতের আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ কেবল মাত্র তাতে স্পর্শ করে বসে থাকতে হয়। হাত আদৌ নিজের বসে থাকবে না। একেবারে অবশভাবে ছেড়ে দিতে হবে। সেই হাতের উপর ভর করে মৃতব্যক্তির আত্মা প্ল্যানচেটে লিখে থাকে। কেবলমাত্র হাতের উপর আত্মার ভর হয় বলে, এক্ষেত্রে মিডিয়াম আবিষ্ট হয় না।

জিজ্ঞাসা করলুম— কোনো বিশেষ স্থানে বাস করেন?

তিনি বললেন— শূন্য আকাশে।

প্রশ্ন— সে কি সীমাবদ্ধ আকাশ?

তিনি বললেন— এখনো তো সীমা রেখা দেখতে পাইনে।

সত্যেনের একটা কথা লিখতে ভুলেচি। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম ; বাংলার আধুনিক কবিদের সম্বন্ধে তোমার মত কী?

সত্যেন্দ্র উত্তর করেছিল— অনেকেরই ভিতর পদার্থ আছে, কিন্তু জানি ঠিক সুর নেই।

ব্যাপারখানা ঠিক কি তা জোর করে বলতে পারিনে। মনে হ'ল যেন ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গেই কথা কওয়া হোল। সন্দেহ মাত্র নেই যে, বুলার (উমা দেবীর) ভাষা নয়, ভাবও নয়। আমারও নয়, যেহেতু আমি যা ভাবি ও ভাবতে পারতুম, তার সঙ্গে অনেকটাই মেলে না। ...দেহহীন আত্মা কি রকম এবং তার চিত্তবৃত্তি কি ভাবের কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞান মানলে দেহটাই যে কোন বস্তুর মত প্রতীত হয়, সে রহস্য ভেদ করা যায় না।— বস্তুর মূলে অবস্তু, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনির্বচনীয় পদার্থ : এই মায়াকে যদি মানতে পারি তবে দেহহীন সত্তাকেও মানতে দোষ নেই, অবশ্য যদি তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকাল প্রমাণ সংগ্রহ চলছে। এখন সর্বজনসম্মত বিশ্বাসে পৌঁছায়নি।"— *দেশ,* ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮।

রবীন্দ্রনাথ যে পরলোক অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তা তাঁর জন্মান্তরবাদে প্রগাঢ় বিশ্বাস থেকেও অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু কবিতায় জন্মান্তরের কথা বলে গেছেন। যেমন একটি :

তোমারই যেন ভালবাসিয়াছি
          শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
          গাঁথিয়াছে গীতিহার
কতরূপ ধরে পরেছ গলায়
          নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

মৃত্যুর পরের অবস্থা এবং জন্মান্তর নিয়ে যে গভীর রহস্য রয়েছে রবীন্দ্রনাথ তা এক সময় প্ল্যানচেট, মিডিয়ম প্রভৃতির সাহায্যে একজন পরলোকতত্ত্ববিদের ন্যায় বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন এবং এ সম্বন্ধে তিনি যে বিশ্বাসী হয়েছিলেন, তা তাঁর এই বিষয়ক রচনাগুলি থেকেও বুঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবনে একটি ভৌতিক ঘটনারও সাক্ষী হয়ে রয়েছেন। সেটি এই :

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষাট্। সেই সময়কার ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাটি তাঁর সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, শিল্পী ও লেখক শ্রীবাসব ঠাকুরের কাছে একবার নিজে বলেছিলেন বাসব। ঠাকুর পরে এই কাহিনীটি *যুগান্তর সাময়িকী*-তে লেখেন।

কাহিনীটির সত্যতা সম্বন্ধে আমি নিজেও একদিন বাসব ঠাকুর মশায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে বাসববাবু বলেছিলেন— আমি রবীন্দ্রনাথের মুখে যেমন শুনেছি, ঠিক তেমনিই লিখেছি, তবে তাড়াতাড়ি *যুগান্তর*-এর লেখা একটা ভুল হয়ে গেছে। *যুগান্তর*-এর "বড় বৌদি" প্রকাশিত হয়েছে, বড় বৌদি হবে না, বড়দিদি হবে।

এই বলে বাসববাবু কাহিনীটি আবার আমাকে শুনিয়েছিলেন।

বাসববাবুর কাছে বলা রবীন্দ্রনাথের সেই কাহিনীটি এই :

রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি একসময় প্রতি বৎসর রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫ বৈশাখ তারিখে অতি ভোরে উঠেই ভাই-এর ঘরে ধূপধুনো জ্বেলে, ফুল দিয়ে আসতেন। রবীন্দ্রনাথ ঘুম থেকে উঠবার আগেই তিনি এ সব করতেন।

সেবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মদিনে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছিলেন। ২৫ বৈশাখ ভোরে ঘুম থেকে উঠেই তিনি দেখলেন, তাঁর মাথার কাছে, টেবিলে টাটকা ফুল সাজানো, ধূপদানীতে ধূপ জ্বলছে, আর ধুনোর গন্ধে ঘর ভরপুর।

রবীন্দ্রনাথ এই সব দেখেই ভাবলেন, প্রতিবারের ন্যায় বড়দিদিই নিশ্চয় এবারও এ সব সাজিয়ে রেখে গেছেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে পড়ে গেল, তাই ত বড়দিদি যে মাস দুই আগে মারা গেছেন।

তখন ভাবলেন, তাহলে অন্য কেউ রেখে গেছে।

ওই সব কে রেখে গেছে, জানবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বাড়ির সকলকেই একে একে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই বললেন যে, তাঁরা কেউই রাখেন নি এবং কাউকে রেখে যেতেও দেখেন নি।

রবীন্দ্রনাথ তখন ভাবলেন— তবে কি এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার হল! প্রতি বারের ন্যায় এবারও বড়দিদির আত্মাই কি রেখে গেল।

কে যে সেদিন অত ভোরে ফুল ইত্যাদি রেখে গিয়েছিল, এ রহস্য বরাবরই রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ভালো জমাটি ভূতের গল্পও লিখে গেছেন। এই গল্পগুলির মধ্যে 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা' ও 'মাষ্টার মশায়' এই তিনটি গল্প রচনার

মূলে নাকি রবীন্দ্রনাথের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ছিল। এ কথা অনেকেই বলে থাকেন। এ সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন :

এই তিনটি গল্পেই রবীন্দ্রনাথ নিজের অনুভূতি অভিজ্ঞতাকে কম বেশী কাজে লাগিয়েছেন। ক্ষুধিত পাষাণের পরিকল্পনা যুগিয়েছে কৈশোরে আমেদাবাদে শাহীবাগ প্রাসাদের অভিজ্ঞতা।

মণিহারার কাহিনী রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতালব্ধ না হলেও এর পিছনে তাঁর প্রগাঢ় অনুভূতির প্রেরণা অস্বীকার করা যায় না। ফণীভূষণ সাহা রবীন্দ্রনাথের বেনামদার নয় জানি, কিন্তু এটাও সত্যি যে তিনিও এককালে পাটের ব্যাবসা করে বেশ কিছু টাকা জলে দিয়েছিলেন। ফণীভূষণ সাহার গল্প তাঁর কোন অংশীদারের বা কর্মচারীর অভিজ্ঞতা নির্ভর হওয়া অসম্ভব নয়।

মাষ্টার মশায়ের উপক্রমণিকায় ভৌতিক অনুভূতির বাস্তব পরিবেশ রয়েছে। কাহিনীর প্রথম পরিকল্পনা যে উপলক্ষে ও যেভাবে হয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথ বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বিপিনবিহারী গুপ্তকে যা বলেছিলেন, সে কথা বিপিনবাবু তাঁর *রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ* গ্রন্থে লিখে গেছেন। সেই লেখাটা এখানে উদ্ধৃত করছি :

একদিন Woodlands-এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। নাটোরের মহারাজাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মহারাণী (কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী) বলিলেন— রবিবাবু এইবার আপনি একটি ভূতের গল্প বলুন। আপনি যে ভূত দেখেন নাই তা হ'তেই পারে না। আপনাকে ভূতের গল্প বলতেই হইবে।

অগত্যা আমি বলিলাম— আচ্ছা তবে একটা ঘটনা বলতে পারি—

নাটোরের মহারাজা সেই ঘটনার কতকটা অবগত আছেন। তিনি এ সম্বন্ধে কতক দূর পর্যন্ত সাক্ষ্য দিতে পারেন।

একদিন নিমন্ত্রণ পার্টি হইতে ফিরিতে অনেক রাত হইল। নাটোরের মহারাজা বলিলেন— রবিবাবু, আমার গাড়ি প্রস্তুত, আসুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া যাইতে পারিব। অনেক দূর গিয়া আমি মহারাজার গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। বলিলাম— কোথায় আপনার বাড়ি আর কোথায় জোড়াসাঁকোয় আমার বাড়ি, অত ঘুরিয়া যাওয়া আপনার পক্ষে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসুবিধাজনক। আমি এইখান হইতে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ি করিয়া যাইতে পারি।

মহারাজার সনির্বন্ধ নিষেধ আমি মানিলাম না, কিন্তু পরে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল।

এই পর্যন্ত বলিয়া আমি থামিলাম। মহারানি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন— তারপর?

আমি বলিলাম— একখানা মাত্র ভাড়াটিয়া গাড়ি রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়াইয়াছিল। গাড়োয়ানকে বলিলাম— জোড়াসাঁকোয় অমুক জায়গায় আমাকে লইয়া চল, সে কিছুতেই রাজি হইল না। নাটোরের মহারাজা তখন তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন— ভাড়াটিয়া গাড়ির টিকিট লইয়া এখানে রহিয়াছে, নিশ্চয়ই যাইতে হইবে। নহিলে পুলিশের হাতে দিব। এই বলিয়া তাহার গাড়ির নম্বর টুকিয়া লইলেন। পুলিশের ভয়ে সে রাজি হইল।

আমি গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। মহারাজা চলিয়া গেলেন।

আমি নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলাম। গাড়ি চলিতে লাগিল, খানিকক্ষণ পরে বুঝতে পারিলাম যে আমার পরিচিত বড় রাস্তা দিয়া গাড়ি চলিতেছে না ; অপরিচিত অন্ধকার গলির ভিতর দিয়া গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছে। কিছু বুঝিলাম না। ভাবিলাম, বোধহয় সহজেই বাড়ি পৌঁছাইব, কিন্তু পথ যেন আর ফুরায় না। হঠাৎ বোধ হইল যেন, গাড়ির মধ্যে আমি একাকী বসিয়া নহি, কে যেন আমার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া আছে। আমি অন্ধকারে হাত বাড়াইলাম, কিছুই হাতে ঠেকিল না। আবার চুপ করিয়া বসিলাম। আবার সেই রকম যেন মনে হইতে লাগিল। মনটা যেন কেমন ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। গাড়ির পিছনে যে ছোকরা বসিয়াছিল তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম— ওরে তুই ভিতরে এসে বোস্‌।

সে বলিল— না বাবু, আমি ভিতরে যাব না। যতই আমি তাহাকে আহ্বান করি, ততই জোর করিয়া সে বলিতে লাগিল— না বাবু আমি ভিতরে যাব না।

এদিকে গাড়ি একেবারে গড়ের মাঠে রেড রোডের নিকটে গিয়া উপস্থিত। গাড়োয়ানকে ডাকাডাকি করিলাম কোনও ফল হইল না। সেই বিস্তৃত ময়দানে, সেই চন্দ্রালোকিত গভীর নিশীথে, গাড়ি ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। আমার গা ঘেঁষিয়া কি যেন একটা জিনিস রহিয়াছে অনুভব করিতে লাগিলাম। সবলে দুই হাত দিয়া সেটাকে যেন ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম। সহসা দেখিলাম যেন, গাড়ির ভিতরে একটা বিকট হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমি চিৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম, মাথা ঘুরিয়া গেল। খানিক পরে বুঝিতে পারিলাম, ভোর হইয়া আসিতেছে এবং আমাদের বাড়িরও সন্নিকটবর্তী হইয়াছি।

পরদিন নাটোরের মহারাজাকে রাত্রির কথা বলিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া থানায় গেলেন। দারোগা আমাদের কাহিনী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— আপনাদের গাড়ির নম্বর কত?

নম্বর শুনিয়া— বলিল— আপনারা যদি কাল রাত্রে গাড়োয়ানকে ধরিয়া লইয়া থানায় আসিতেন, তাহা হইলে এমন হয়রান হইতে হইত না, অনেক দিন হইল একজন কেরাণি অফিস হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় ওই গাড়ি করিয়া গড়ের মাঠে গিয়া

ওই গাড়িতেই আত্মহত্যা করে। তদবধি রাত্রিকালে ও গাড়িতে লোক চড়িলেই ভয় পায়। আমরা তাহা জানিতে পারিয়া পাছে ওই গাড়ির লাইসেন্স বন্ধ করিয়া দিই, এই ভয়ে গাড়োয়ানটা রাত্রে আর সওয়ার লয় না।

এই পর্যন্ত বলিয়া থামিলাম। কুচবিহারের মহারানি বলিলেন— 'হ্যাঁ, সত্য নাকি?

আমি হাসিয়া বলিলাম— না, মোটেই সত্য নয়। গল্প করিলাম মাত্র।

এই গল্পটি পরে নূতন করিয়া লিখিয়াছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রথম দিকে সন্ধ্যার সময় প্রায়ই আশ্রমের ছাত্রদের নিয়ে তাদের নানা রকমের গল্প শোনাতেন একবারের বলা একটা ভূতের গল্প-সম্বন্ধে, সেই গল্পের আসরের শ্রোতা আশ্রমের তখনকার ছাত্র সুব্রত কর তাঁর 'শিশু আসরে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে যা লিখেছেন, সেই গল্পটা এখানে দিলাম—

একবার তিনি শিলাইদহে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যার ট্রেনে পৌঁছবার কথা ছিল। ট্রেন মিস্ করে কুস্টিয়াতে নেমেছেন রাত্রির ট্রেনে ; রাতদুপুর ; পদ্মার পারে অপেক্ষা করছেন। আশেপাশে কোনো নৌকা নেই। এমন সময় দেখলেন, একটি মাত্র ছোট নৌকো সেদিকেই আসছে। নৌকোর মাঝি গুরুদেবের চেনা, তাঁর জমিদারির এক পুরাতন প্রজা! বাবুকে সেলাম ক'রে বলল— আসুন কর্তা, আমার নৌকোয় ; আপনাকে পৌঁছে দেব ; গুরুদেব বললেন— আমার বড় বোটটা কোথায় গেল? সে বলল,— সেটা বোধ হয় আপনাকে না পেয়ে ফিরে গেছে। বিছানাপত্র সে-ই গুছিয়ে দিল। গুরুদেব নৌকোয় উঠে শুয়ে পড়লেন। অন্ধকার, ওদিকে দীর্ঘ পথ। সাড়া নেই, শব্দ নেই। মনে হচ্ছে নদীও নিশ্চল। শুধু লগির শব্দ, আর জলের ছপ্‌ছপ্— এই চলছে সমস্তরাত! মাঝি প্রাণপণ বেয়ে চলেছে। ভোর হয়ে এলো মুরগির ডাকে। নৌকোও পাড়ে এসে লাগল। অনুগত প্রজাটি একটু আসছি।— এই বলে সেই যে সে গেল আর তার দেখা নেই! গুরুদেব নৌকোয় বসেই আছেন। বেলা হল ; লোকজন এল। ওইভাবে নৌকোয় গুরুদেবকে বসে থাকতে দেখে সকলে তো অবাক,— কখন তিনি এখানে এলেন? রাত্রে তো ঘাটে কোনো নৌকো ছিল না। গুরুদেব বললেন, কেন? তাঁর সেই প্রজাটিই তো সারারাত নৌকো বেয়ে নদী পার করে দিয়েছে। কিন্তু সে 'আসছি' ব'লে গেল কোথায়। গুরুদেবের মুখে লোকটির নাম শুনে তো সবার চক্ষুস্থির। সকলে বললো সে অনেকদিন হল মারা গেছে! গুরুদেব চমকে উঠলেন, সে কি। গুরুদেবের জন্য অন্য নৌকোর ব্যবস্থা হল। গুরুদেব তাতে গিয়ে চড়ে বসলেন। পিছন ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখেন— সে কী! কোথায় গেল সেই ছোট নৌকাটি!

এই গল্পের কতটা সত্যি, আর, কতটা গুরুদেবের নিজের নিজের বানানো,— তিনিই জানেন, কিন্তু গল্প শুনে সকলের গা ছম্‌ছম্ করতো।

ভূতের প্রতি নবীনচন্দ্রের ক্ষমা

কবি নবীনচন্দ্র সেন যখন চট্টগ্রামে স্কুলে পড়তেন, তখন সেখানে পিতৃ-মাতৃহীন নিতান্ত দরিদ্র, তাঁর এক সহপাঠী ছিল। নবীনচন্দ্র সময় সময় তাকে কাপড় ও বই কিনে দিতেন।

নবীনচন্দ্রের এই সহপাঠীটি পড়াশুনাতেও আদৌ ভালো ছিল না। সে কেবল চালাকি করে কপি করে পাস করত। সেই জন্য স্কুলের শিক্ষক মশায়রা তার নাম দিয়েছিলেন, চালাক দাস।

চালাক দাসের চালাকি কিন্তু বেশি দিন চলল না। বর্তমানের ৭ম কি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েই তাকে পড়া ছাড়তে হয়েছিল।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে নবীনচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে চট্টগ্রামে গেলে, উক্ত চালাক দাস একটি চাকরি পাবার জন্য নবীনচন্দ্রের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল। নবীনচন্দ্র তার অভাব দেখে বহু চেষ্টায় একটি কেরাণির পদ সৃষ্টি করে, তাকে কাজে বহাল করেন এবং কিছুদিন পরে তার মাহিনাও বাড়িয়ে দেন।

কয়েক বছর যেতে না যেতেই এই চালাক দাসই কিন্তু আরও চালাক হয়ে নিজের পদোন্নতির লোভে সাহেবদের পদ লেহন করে, নবীনচন্দ্রকে রাজবিদ্রোহী এবং সংবাদপত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষীয়দের ও গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখক বলে, মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে নবীনচন্দ্রের অত উপকারের প্রতিদান দিয়েছিল। এরপরেও সে নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্রের বিরোধিতা করতে ছাড়েনি।

তাই নবীনচন্দ্র এর নাম দিয়েছিলেন শয়তান দাস বা সাহেব দাস। অকৃতজ্ঞ শয়তান দাস জীবিতকালে উপকারী নবীনচন্দ্রের এত অপকার সাধন করলেও মৃত্যুর পরে তার আত্মা কিন্তু অনুতপ্ত ছিল এবং ওই সময় আত্মা নবীনচন্দ্রের কাছে গিয়েছিল। নবীনচন্দ্র তখন অসুস্থ হয়ে বৈদ্যনাথে বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করছিলেন।

এ সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র তাঁর "আমার জীবন" গ্রন্থে লিখেছেন :

বৈদ্যনাথ রেলওয়ে স্টেশনের ঠিক পশ্চাৎভাগে একটি সুন্দর দ্বিতল গৃহ আছে। উহা বৈদ্যনাথের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গৃহ বলিলেও চলে। শ্রীভগবান বৈদ্যনাথের কৃপায় এ বাড়িখানি খালি ছিল। আমি তখনই উহা ভাড়া করিয়া সে বাড়িতে গেলাম এবং

বাড়িখানি পাইয়া প্রাণে বড় আনন্দ হইল। এ বাড়িতে গিয়াই আমার দিন দিন স্বাস্থ্য ভালো হইতে লাগিল। ইহার দ্বিতল হইতে চারিদিকে বড় সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা দেখা যায়। কয়েকদিন পরে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

একদিন প্রভাত হইয়াছে। শার্সি দিয়া ঘরে উষার আলোক আসিতেছে। আমি ঠিক উষার সময়ে জাগি। কিন্তু ডাঃ চার্লস বলিয়া দিয়াছেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসেও বৈদ্যনাথে প্রাতে খুব কনকনে শীত থাকে। অতএব বেশ রৌদ্র না উঠিলে যেন আমি শয্যা ত্যাগ না করি। আমি জাগিয়া আছি। এমন সময়ে একজন লোক যেন বুটপায়ে খুব জোরে নীচে হইতে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে। সিঁড়ি নীচের ঘরের বাহির দিকে। আমি কে? কে? জিজ্ঞাসা করিলাম। কোনও উত্তর পাইলাম না। উপরে দুটি ঘর। একটি বড় হল, তাহার পশ্চাতে একটি ছোট লম্বা কক্ষ। হলের তিন দিকে তিনটা আয়ত বারান্দা কিন্তু এক বারান্দা হইতে অন্য বারান্দায় যাওয়া যায় না। লোকটি উত্তরের বারান্দা হইতে যেন লাফাইয়া পশ্চিম বারান্দায় গেল। আমি তখনও কে? কে? করিতেছি। কোনও উত্তর নাই। পশ্চিম বারান্দায় বাড়িওয়ালার একটা তক্তপোশ আছে। আমরা তাহাতে বসিয়া সুদূরস্থ নীল শৈল-শ্রেণির আকাশপটে চিত্রিতবৎ শোভা দেখিতাম। সে একটি লাঠির দ্বারা এই তক্তপোশে এমন তিনটি গুঁতা দিল যে, সমস্ত বাড়ি কাঁপিয়া উঠিল। আমার সঙ্গে হল কক্ষে স্বতন্ত্র কেম্পখাটে পুত্র এবং পশ্চাতের কক্ষে আর একটি তক্তপোশে স্ত্রী ও নীচে একটি বালক ভৃত্য শুইয়াছিল। সকলে জাগিল। আমি কে? কে? বলিয়া চেঁচাইতেছি। পুত্র ভয়ে তাহার বিছানায় বসিয়া কাঁদিতেছিল। কোনও উত্তর না পাইয়া, নীচের ঘরে আমার কনিষ্ঠ সহোদর ও পাচক ও এক ভৃত্য শুইয়াছিল, আমি তাহাদের নাম করিয়া ডাকিলাম। কোনও উত্তর নাই। বালক ভৃত্য বারান্দায় গিয়াছে না কি জিজ্ঞাসা করিলে স্ত্রী বলিলেন— সেও বিছানায় বসিয়া ভয়ে কাঁদিতেছে।

আমি বললাম— একি বিচিত্র কথা! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। বালক ভৃত্যকে দ্বার খুলিতে বলিলাম। তাহার পর আমরা সমস্ত বারান্দা ও নীচের ঘর ও চারিদিকের মাঠ দেখিলাম। কোথাও কোনো লোকের চিহ্ন মাত্র নাই। ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিলাম না।

প্রাতে পেন্‌সনপ্রাপ্ত বৈদ্যনাথবাসী ও হাওয়াখোর বাবুরা প্রায়ই কবিদর্শনে আসিতেন। আজ প্রাতে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের একথা বলিলে, তাঁহারা বলিলেন যে, বৈদ্যনাথে বড় চোরের ভয়। এ কোনও চোরের কার্য।

কিন্তু চোর প্রভাতে আসিয়া এরূপ তক্তপোশে গুঁতা দিবে কেন?...কিছুক্ষণ পরে ডাক আসিল। কলিকাতা হইতে সেই জ্যোতিঃ সম্পাদকের একখানা কার্ড পাইলাম। তাহাতে লেখা আছে যে, পূর্বদিন কলিকাতায় সেই শয়তানের কন্যার কাছে এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে, তাহার পিতার সেদিন প্রাতে মৃত্যু হইয়াছে।...

সে দিন সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাদের কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। অন্য দিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমরা বারান্দায় কাটাইয়াছি এবং ঘরের চারিদিকের বিস্তৃত মাঠে বেড়াইয়াছি, কিন্তু আজ যেন এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে যাইতে ভয় হইতেছে।...

আমার সিস্টাইটিস্ রোগ। রাত্রিতে ভালো নিদ্রা হয় না। বহু বার উঠিয়া প্রস্রাব করিতে হয়। সমস্ত রাত্রি যেন ঘরের খড়খড়ি পড়িতেছিল। ঠিক যেন বাহির হইতে কেহ নাড়িতেছে।

পর দিবসের রাত্রিও এইভাবে কাটিল।

তৃতীয় দিবস আমার খুড়তুতো ভাই রমেশের পত্র পাইলাম যে, ঠিক যে সময়ে আমাদের বাড়িতে সেই উপদ্রব হইয়াছিল, সেই সময়ে শয়তানের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। অনেকের সন্দেহ যে, সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। রমেশ আরও লিখিয়াছে, সেই দিন ৪টার সময়ে আমাদের পাহাড়ের রান্নাঘর ইত্যাদিতে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। কীরূপে আগুন লাগিল, কেহ বলিতে পারে না।...

আমি প্রাতে উঠিয়া স্ত্রীকে বলিলাম— কাল রাত্রিতে বুঝি ভ্রাতা কপাটগুলি খোলা রাখিয়া শুইয়াছিলেন, কি বারংবার কপাট খুলিয়া বাহিরে যাতায়াত করিয়াছিলেন। কপাটের শব্দে আমি এক মুহূর্ত নিদ্রা যাইতে পারি নাই।

আমি স্নানকক্ষে গেলাম, স্ত্রী বিষয় কি জানিতে নীচে গেলেন।

তিনি ফিরিয়া আসিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া বলিলেন— না! আমাদের এ বাড়িতে থাকা হইবে না। অন্য বাড়ি দেখ। কাল রাত্রিতে অতুল ও চাকরেরাও ঘুমাইতে পারে নাই। সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে।

ভ্রাতা, পাচক ও ভৃত্য স্ত্রীর পিছে পিছে আসিয়াছিল। দেখিলাম, তাহাদের চোখ কপালে উঠিয়াছে। তাহারা বলিল যে, আহারের পর কপাট অন্ধ করিয়া তাহারা শুইতে যাইতেছে, এমন সময় বোধ হইল যেন, দক্ষিণ দিকের কপাটে কে ধাক্কা দিতেছে। তাহারা কোনও ভিখারী কি পাগল মনে করিয়া লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া চারিদিকে দেখিল, কিন্তু কোনও লোকের সাড়াশব্দ পাইল না তাহার পর আবার শুইতে যাইতেছে, আবার সেরূপ কপাট যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। আবার তাহারা বাহির হইয়া দেখিল, কিছুই দেখিতে পাইল না। এরূপে তিনচারি বার দেখিয়া তাহারা দা ও লণ্ঠন সম্মুখে রাখিয়া তিনজনে ভয়ে জড়সড় হইয়া রাত্রি কাটাইয়াছে।

স্ত্রী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বলিতেছেন— শ্রীনাশা মরিয়াও আমাদের তিষ্ঠিতে দিবে না।

আমি অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলাম— আমি এ জীবনে তাহার কোনও অনিষ্ট করি নাই, বরং যথাসাধ্য ছাত্রজীবন হইতে তাহাকে সাহায্য করিয়াছি। যদি আমাকে এরূপ

হিংসা করিয়াছে বলিয়া তাহার আত্মার অশান্তি হইয়া থাকে, আমি তাহাকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিলাম। শ্রীভগবানও তাহাকে ক্ষমা করুন। যেন আর আমাদের প্রতি এ উৎপাত না করে।

আমরা ইহার পর এক মাসের অধিক বৈদ্যনাথে ছিলাম। আর কখনও কোন উৎপাত হয় নাই।"

করুণানিধানের মৃত আত্মীয়

'রবি-বাসর' নামক সাহিত্যিক সংস্থার প্রথম বর্ষের (১৩৩৭) এক অধিবেশনে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ অভিজ্ঞতা থেকে একটি আশ্চর্য ভৌতিক কাহিনী শুনিয়েছিলেন। রবিবাসরের ওই অধিবেশনে ভারতবর্ষ-সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন, অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, জীবনী-লেখক মন্মথনাথ ঘোষ, কবি নরেন্দ্র দেব, শৈলেন লাহা প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। রবিবাসরের সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ১৩৬২ সালের চৈত্র সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় 'মৃত্যুর পরে' নাম দিয়ে এক প্রবন্ধে করুণানিধান বর্ণিত ওই ভৌতিক কাহিনীটি লিখেও ছিলেন।

সেদিন সভায় করুণানিধান এইভাবে কাহিনীটি বলেছিলেন :

আমার এক আত্মীয় চুঁচুড়ায় হুগলী কালেক্টারী অফিসে কেরানির কাজ করত। সে অবিবাহিত এবং খুব খেয়ালি যুবক ছিল। সংসারে তার কোনো বাঁধন বা দায়িত্ব কিছুই ছিল না। সে প্রায়ই শনিবার দিন অফিসের ছুটির পর আমাদের কলকাতার বাসায় বেড়াতে আসত। শনিবার, রবিবার আমাদের কাছে কাটিয়ে সোমবার সকালে খেয়ে কলকাতা থেকে চুঁচুড়ায় অফিসে যেত। আমরা সকলেই তাকে ভালোবাসতাম। সে এক এক সময় শুক্রবারে সন্ধ্যার সময়ও কলকাতায় চলে আসত। এইভাবে অহেতুক শনিবারটা কামাই করার জন্য আমি তাকে বকতাম সে কোনো উত্তর দিত না।

কিছুদিন আগে সে একদিন শুক্রবারে সন্ধ্যার পরে আমাদের কলকাতার বাসায় এল। এসে একবার সে নিজেই উপযাচক হয়ে বললে— "কাল অফিসে ছুটি নিয়েছি।" শনিবার গেল, রবিবার সকালে সে মাংস কিনে আনল। সে মাংস রান্না হ'লে সকলে "মিলে বেশ আমোদ করে খাওয়া গেল। তিন রাত দু দিন কাটিয়ে সোমবার সকালে ৯টার সময় বাড়িতে খেয়ে সে অফিস রওনা হল। বিডন স্ট্রিট কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের সংযোগ স্থলে সে ট্রামে উঠল। বাড়ি থেকে আমিও তার সঙ্গে রওনা হয়েছিলাম। তাকে ট্রামে তুলে দিয়ে বিডন স্ট্রিট ধরে একটু আগিয়ে আমি ছাতুবাবুর বাজারে গেলাম। সামান্য কিছু কিনে আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফিরলাম।

বাড়ি পৌঁছে দেখি, একজন টেলিগ্রাফ পিওন বাইরে অপেক্ষা করছে। আমারই নামে "তার" এসেছে। সই করে দিয়ে টেলিগ্রাফ পড়লাম। সে টেলিগ্রাফের মর্ম

এই— আপনার আত্মীয় (অর্থাৎ হুগলী কালেক্টারী অফিসের আমার ওই কেরাণি আত্মীয়) গত শুক্রবার সন্ধ্যার পরে হাসপাতালে কলেরায় মারা গেছেন। সংবাদ দিতে একটু দেরি হ'ল। সে জন্য ক্ষমা চাইছি— ইতি জনৈক বন্ধু।

প'ড়ে ভাবলাম, আমার সঙ্গে একি রসিকতা! মাত্র আধঘণ্টা আগে, তাকে ট্রামে তুলে দিয়ে এলাম, আর সে কিনা শুক্রবারে মারা গেছে।

বাড়ির সকলেও শুনে বললে— ও টেলিগ্রাফ ছিঁড়ে ফেলে দাও। ও নিয়ে মাথা ঘামিও না।

আমার কিন্তু মনটা কেমন কেমন করতে লাগল। অগত্যা স্নানাহার সেরে দুপুরে চুঁচুড়া রওনা হলাম। আত্মীয়টির অফিসে গেলে, তার ৫।৭ জন বন্ধু আমায় এসে ঘিরে ধরল। তাদেরই একজনের একটা চেয়ারে বসলাম। তখন তারা বলে যেতে লাগল— বৃহস্পতিবার রাত্রেই আপনার আত্মীয়টির কলেরার লক্ষণ দেখা যায়। শুক্রবার সকালে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু ডাক্তারদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে ওইদিন সন্ধ্যার পর সে মারা গেল। রাত্রেই সংবাদ পেয়ে আমরা মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাই। শনিবার সকালে দাহ করে যে যার বাড়ি ফিরি। ওইদিন ক্লান্ত থাকায় আপনার আর সংবাদ দিতে পারি নি। রবিবার গোলমালে কেটে যায়। আজ সকালেই আপনাকে টেলিগ্রাফ করি। সংবাদ দিতে আমাদের এই দেরি হওয়ার জন্য আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তাঁদের কথা শুনে, একেবারে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে গেলাম। অবাক হয়ে শুধু ভাবলাম— তিনরাত, দুদিন আমাদের মধ্যে কাটিয়ে গেল, আমরা কিছুই টের পেলাম না, এমন কি তার মধ্যে কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা পর্যন্তও দেখলাম না।

আমি সেখানে আর কোনো কথা ভাঙলাম না। বাড়ি চলে এলাম। বাড়ি এসে তাঁর মৃত্যু সংবাদ শোনালে, বাড়ির সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

আমি আজও এ জিনিষটা ভেবে পাই না যে, একজন মৃত লোক কীভাবে জীবিত লোকের মতো কদিন কাটিয়ে গেল। এ যে আমার চোখে দেখা ঘটনা!

শরৎচন্দ্রের পিতার দেখা ভূত

একদিন সন্ধ্যার সময় শরৎচন্দ্র তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আর 'রবি-বাসর' নামক সাহিত্যিক সংস্থার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, শুনেছি মানুষ মরে গিয়েও আবার দেখা দেয়। কি করে যে এ সম্ভব, তা তো বুঝতে পারিনে।

বিদ্যাভূষণ মশাই বললেন— আমার জীবনে এরকম ঘটনা ঘটেছিল। বহুদিন মৃত আমার এক গুরুজনকে আমি একবার দেখেছিলাম, এমন কি তিনি আমাকে তখন যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে পরে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছিলাম।

শরৎচন্দ্র বললেন— আমার নিজের জীবনে এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি বটে, তবে আমার মামার বাড়িতে একবার এই ধরনের একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। বাবার মুখে তার গল্প শুনেছি, আত্মীয় স্বজনদের মুখেও শুনেছি। ঘটনাটা শুনলেই সব বুঝতে পারবে, শোন—

ভাগলপুরে আমার মামাদের যে পাকা বাড়ি, তার পিছনদিকে তখন একটা দোতলা মাঠকোঠা ছিল। এই মাঠকোঠার একতলায় তিনটি ঘর থাকলেও উপরে কিন্তু সবটা জুড়ে মাত্র একটা বড় ঘর ছিল। নীচের তিনটি ঘরই ব্যবহার করা হত, কিন্তু উপরের ঘরটা ছিল গুদোমঘরের মতো, একরাশ হাঁড়িকুড়ি ও নানারকম জিনিষপত্রে বোঝাই হয়ে থাকত। একটি অল্পবয়সী বউ, ওই দোতলার ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল বলে, ঘরটা কেউ আর ব্যবহার করত না।

মামাদের বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপুজোয় প্রতি বছর খুব ধুমধাম হত। আত্মীয়-কুটুম আসত অনেক। দিনকতক বাড়িঘর লোকে একেবারে গিসগিস করত। একবার পুজোয় এত লোক হল যে শোবার আর জায়গা নেই। জগদ্ধাত্রীপুজোর সময়টা পড়ে একেবারে অঘ্রাণের কাছাকাছি, হিমে ঠান্ডায় খোলা দালানেও শোয়া চলে না। বাবা আর ছোট্‌দাদামশায় অর্থাৎ আমার মায়ের ছোট কাকা, এঁরা ছিলেন একবয়েসি। এঁরা ঠিক করলেন মাঠকোঠার ওই দোতলার ঘরেই শোবেন। জিনিসপত্র সরিয়ে ঘরের খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করা হল। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর ওঁরা গিয়ে দুজনে সেই ঘরে শুলেন।

রাত্রি তখন প্রায় একটা। হঠাৎ বাবা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলেন— ওরে বাবারে! ওখানে কে রে?

চিৎকারে ছোট্‌দাদামশায়ের ঘুম ভেঙে গেল, ধড়মড় করে তিনি উঠে পড়লেন। বাড়ির আরও অনেকে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। সকলের প্রশ্নের উত্তরে বাবা বললেন— জানালার ধারে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘাকৃতি সুন্দর তার চেহারা, গলায় পৈতে আর বড়ো রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় মোটা শিখা। হঠাৎ এত কাছে ওই মূর্তি দেখেই ভয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

বাবার কথা শুনে সকলে তো হেসেই অস্থির।

কেউ কেউ বললেন— স্বপ্ন দেখেছে। মেয়েমানুষের মূর্তি দেখলেও না হয় বুঝতাম একটা কারণ রয়েছে।

বাবা বাড়ির জামাই মানুষ, খুব অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। ভাবলেন— হবেও বা হয়তো স্বপ্নই দেখেছি।

পরের দিন রাত্রে বাবা আর ছোট্‌দাদামশায় দুজনে আবার ওই ঘরে শুয়েছেন। গতরাত্রে ভালো ঘুম না হওয়ায় বাবা শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেদিনও মাঝরাত্রে, আবার একটা বিরাট চিৎকার শোনা গেল। সেদিন আর বাবা নয়, ছোট্‌দাদামশায়। বাবার ঘুম ভেঙে গেল। সকলে আবার ছুটে এলেন। ছোট্‌দাদামশায়ের গা দিয়ে তখন ঘাম ঝরছে। কী হয়েছে জিগগেস করায় ছোট্‌দাদামশায় বললেন— কে একজন জানলার কাছে এসে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। জামাই যাকে কাল দেখেছে ঠিক সে-ই। সেই লম্বাচওড়া চেহারা, গলায় মোটা পৈতে, রুদ্রাক্ষের মালা—

ছোট্‌দাদামশায়ের কথাও কেউ বিশ্বাস করলেন না। বললেন— ও কিছু নয়। জামাইয়ের কাছে শোনা কথা তোমার মনে ছিল, তাই ওই স্বপ্ন দেখেছ।

ছোট্‌দাদমশায় বললেন— তোমরা যাই বল, আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখেছি। সত্যিই হোক আর স্বপ্নই হোক, এ ঘরে আর শোয়া নয়!

আমার দাদামশায়দের অবস্থা ছিল ভালো। অতিথি আত্মীয়-স্বজন প্রায়ই এসে এঁদের বাড়িতে আশ্রয় নিত, আর এঁরা অতিথিবৎসলও ছিলেন খুব। যে ঘটনার কথা বললাম, তার প্রায় বারো-চোদ্দো বছর আগে একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে এঁদের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেই থেকে আর কোথাও তিনি যাননি, এঁদের বাড়িতেই থেকে গিয়েছিলেন। সকলেই তাঁকে ভট্‌চায্যিমশায় বলে ডাকত। ভট্‌চায্যিমশায় খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, শাস্ত্রপাঠ, পূজা অর্চনা এ সব নিয়েই দিন কাটাতেন।

বাবা আর ছোট্‌দাদামশায়ের মুখে পরদিন রুদ্রাক্ষের মালা পরা সেই মূর্তির কথা শুনে ভট্‌চায্যিমশায় বললেন— আজ রাত্রে আমি ওই ঘরে শোব। দিনে ঘরে তুলসী ধুনো দেব, আর রাত্রে সিংহাসন শুদ্ধ নারায়ণ নিয়ে গিয়ে বসাব। দেখি কী হয়!

ভট্‌চায্যিমশায় যথারীতি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে রাত্রে গিয়ে একা ওই ঘরে শুলেন। কিন্তু রাত দুটো নাগাদ সেদিন যে কাণ্ড ঘটল সে আরও সাংঘাতিক। ভয়ে বিকট চিৎকার করে একেবারে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

ঘর ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। তখনকার দিনে দরজায় এখনকার মতো কবজা দেওয়া থাকত না, হাঁসকল থাকত। বাইরে থেকে অনেক চেষ্টায় কোনো রকমে সেই হাঁসকল তুলে দরজা খোলা হল। মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে অনেকক্ষণ বাতাস করবার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। সবাই উদ্‌বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে, কী ব্যাপার?

তিনি শুধু বললেন— আমায় কিছু জিগগেস কোরো না। কিছু বলতে পারব না।

পরদিন সকাল থেকে ভট্‌চায্যিমশায়ের জ্বর এল। এমন জ্বর যে ডাক্তার ডাকা হল। তাঁর চিকিৎসায় কিছুদিন কাটল, কিন্তু জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না। বারো-তেরোদিন পরে তিনি আমার দাদামশায়কে ডেকে বললেন— শুনুন, এ-জ্বর থেকে আমার নিস্তার নেই। আমার হাড়টা যাতে কাশীর মণিকর্ণিকায় পড়ে, সে ব্যবস্থা যদি দয়া করে করেন তো সুখে মরতে পারি।

ভট্‌চায্যিমশায়কে নিয়ে কে এখন কাশী যায়— এই হল তখন সমস্যা। আগেই বলেছি, ছোট্‌দাদামশায় আর বাবা একবয়েসি ছিলেন, আর দুজনের ভাবও ছিল খুব। শেষে ওঁরাই তাঁকে নিয়ে যেতে রাজি হলেন। দিন কয়েক পরেই একজন চাকর সঙ্গে করে ভট্‌চায্যিমশায়কে নিয়ে তাঁরা কাশী যাত্রা করলেন।

কাশীতে ভাড়া-বাড়ির এক তেতলার ঘরে ভট্‌চায্যিমশায়কে রাখা হয়েছিল। ছোট্‌দাদামশায় আর বাবাও ওই একই ঘরে থাকতেন। কদিন কেটে গেল। ভট্‌চায্যিমশায়ের অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকেই যেতে লাগল। তিনদিন ক্রমাগত তাঁর শ্বাস চলছে, এমনি সময় একদিন মাঝরাতে হঠাৎ ছোট্‌দাদামশায় দেখতে পেলেন— একটা লোক জানলার বাইরে থেকে ঘরের ভিতরে কেবলই উঁকি মারছে। ছোট্‌দাদামশায় তখন জেগেছিলেন, বাবা ঘুমিয়েছিলেন। কে? কে? করে তিনি চেঁচিয়ে উঠতেই বাবাও উঠে পড়লেন। জেগে বাবাও স্পষ্ট দেখতে পেলেন— কে একটা লোক যেন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভট্‌চায্যিমশায়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাবা তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু কাউকে কোথাও দেখা গেল না। ঘরে এসে বাবা বললেন— ছোট্‌কাকা, মুখটা কেমন চেনা-চেনা মনে হল না?

ছোট্‌দাদামশায় বললেন— ঠিক বলেছ, আমিও তাই ভাবছিলাম!

পরদিন সকালেই ভট্‌চায্যিমশায় মারা গেলেন।

কাশীতে কিছু লোক আছে, শব দাহই তাদের কাজ। খবর পেয়ে একে একে ছ-সাতজন লোক জুটে গেল। তাদের মধ্যে একজন ছোট্‌দাদামশায়ের কাছে গিয়ে বলল— দেখুন, উনি যখন আপনাদের কেউ নন বলছেন, তখন এক কাজ করুন, আমি সদ্‌ব্রাহ্মণের সন্তান, আমাকেই ওঁর মুখাগ্নির কাজটা করতে দিন।

বাবা আর ছোট্‌দাদামশায় ভাবলেন— তাও তো বটে, আমরাই ওঁর মুখাগ্নি করতে যাই কেন। তাঁরা রাজি হয়ে বললেন— বেশ, তাই হবে, আপনিই মুখাগ্নি করুন।

লোকটি বেশ আগ্রহের সঙ্গেই মুখাগ্নি করল। শুধু তাই নয়, শ্মশানের যাবতীয় কাজও সে প্রায় একাই করল।

যেমন কাজকর্মে চেহারাতেও লোকটি তেমন সুন্দর ও বলিষ্ঠ। বাবা ও ছোট্‌দাদামশায় দু-জনেই মনে-মনে ভাবছেন— একে কোথায় যেন দেখেছি, মুখটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। দুজনেই একই কথা ভাবছেন বটে, কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলছেন না।

সন্ধ্যে নাগাদ সকলেই বাসায় ফিরলেন। অগ্নিস্পর্শ করবার পর, সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককেই জলখাবার এবং আটআনা করে পয়সা দেওয়া হল। কেবল, মুখাগ্নি যে করেছিল, তাকেই খুঁজে পাওয়া গেল না।

ছোট্‌দাদামশায় জিজ্ঞেস করলেন— আপনাদের আর একজন কোথায় গেলেন? তাঁকে দেখছি না যে।

তারা বললে— সে তো মশায় আপনাদেরই লোক, আমাদের দলের কেউ নয়। ওকে তো আগে আমরা কখনও দেখিনি।

বাবা আর ছোট্‌দাদামশায় তখন কিছুই প্রকাশ করলেন না। তারা চলে গেলে বাবা বললেন— ছোট্‌কাকা, একটা কথা বলবে? আমরা দেশে যাকে দেখেছিলাম, এ সে-ই কিনা, ঠিক করে বলো তো?

ছোট্‌দাদামশায় বললেন— হ্যাঁ, এ সেই লোকই, তাতে আর সন্দেহ নেই। ও যখন আমার কাছে এসে মুখাগ্নির কথা বললে, তখন থেকেই আমার মনে হচ্ছে, একে যেন আগে কোথায় দেখেছি। আশ্চর্য ব্যাপার! দাহ পর্যন্ত করে গেল, কিছু বুঝতে দিলে না!

দেশে ফিরে এসে তাঁরা সকলকে সমস্ত কথা খুলে বললেন। সকলেই বিস্মিত হলেন, কিন্তু সেই রহস্যের কোনো কিনারা কেউই করতে পারলেন না।

বাড়িতে ভট্‌চায্যিমশায়ের একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ছিল। ব্যাগটি খুলে দেখা গেল, তাতে কখানা গরদের জোড়, দানে পাওয়া সাত-আটটা সোনার নথ, পাঁচটা কি ছটা সোনার আংটি, আর খানকতক চিঠি রয়েছে। একটি চিঠির মধ্যে ভট্‌চায্যিমশায়ের বাড়ির ঠিকানা ছিল। দাদামশায় বললেন— ভট্‌চায্যিমশায়ের দেশের পোস্টমাস্টারের নামে একখানা চিঠি লিখে দাও, তিনি যেন অনুগ্রহ করে ওঁর মৃত্যুসংবাদটা আত্মীয়দের জানান। আর এখানে ভট্‌চায্যিমশায়ের যা জিনিসপত্র রয়েছে, তাঁর আপনার কোনো লোক এলেই সেগুলি তাঁকে দিয়ে দেওয়া হবে।

লেখা হল চিঠি। অনেকদিন পরে মধ্যবয়সি এক বিধবা স্ত্রীলোক একদিন মামাদের বাড়িতে এসে পরিচয় দিলেন তিনি ভট্‌চায্যিমশায়ের এক জ্ঞাতি ভাইপোর স্ত্রী। তাঁর গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোকের চিঠি, আর পোস্টমাস্টারকে লেখা সেই চিঠিখানাও সঙ্গে এনেছেন।

তাঁর কাছে জানা গেল— ভট্‌চায্যিমশায় সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী আগেই মারা যান। এক ছেলে ছিল, সে টোলের উপাধি পেয়েছিল। একদিন

কি কারণে বাপ-ছেলের মধ্যে খুব ঝগড়া হয়। সেইদিনই দেখা গেল, ছেলে বাগানের একটা গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ভট্‌চায্যিমশায় বাড়িতে আর টিকতে পারেননি, ওঁর যা কিছু ছিল আত্মীয়দের দান করে, সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়েন।

ভট্‌চায্যিমশায়ের ছেলের চেহারাটা ছিল খুব সুন্দর। বেশ বলিষ্ঠ, লম্বা-চওড়া, মাথায় মোটা টিকি। তার একটি শখ ছিল— সাত-আট দণ্ডী মোটা পৈতে খুব করে মেজে ঘসে গলায় পরতে ভালোবাসত। চেহারার বর্ণনা শুনে বাবা আর ছোট্‌দাদামশায় দুজনেই বললেন— একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে, আমরা যাকে দেখেছি সে এই ছেলেটিই।

বোঝা গেল, ভট্‌চায্যিমশাই তাহলে মাঠকোঠার ঘরে তাঁর মৃত ছেলের চেহারা দেখেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেইজন্যই এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে অস্বীকার করেছিলেন। আত্মঘাতী ছেলে বোধ হয়, অনুতপ্ত হয়ে মৃত্যুর পরও বাপের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে, আর শেষ পর্যন্ত একটা মূর্তি ধরে পুত্রের কর্তব্য তাঁর মুখাগ্নিও করে গেছে।

ক্ষিরোদপ্রসাদের "অলৌকিক রহস্য"

নাট্যকার ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ একজন ঘোরতর ভূত-প্রেত বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একটানা প্রায় ৬ বছর ধরে "অলৌকিক রহস্য" নামে একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। এই পত্রিকায় তিনি প্রধানত পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত ভৌতিক কাহিনী সকল মুদ্রিত করতেন। দীর্ঘ ছ বছর ধরে তিনি তাঁর পত্রিকায় বাস্তব বলে বর্ণিত বহু ভৌতিক কাহিনী প্রকাশ করেছেন। এখানে তা থেকে দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত একটি কাহিনী উদ্ধৃত করছি। সে কাহিনীটি এই :

"ঁহেমেন্দ্রনাথ সেন অল্পদিন পূর্বে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কেশিয়ার বা ছোট খাজাঞ্চি ছিলেন। যুবক হেমেন্দ্রনাথ কবিবর নবীনচন্দ্রের সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র এবং কবিবরের জন্মভূমি নয়াপাড়াতেই তাঁহার বাসস্থান।

চট্টগ্রামে তদানীন্তন অফিসিয়েটিং সিভিল সার্জন রায় বাহাদুর রজনীনাথ সেন হেমেন্দ্রবাবু ভগিনীপতি। তিনি যুবক হেমেন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং সর্ব বিষয়ে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

একদিন অফিসের খাজনাখানা হইতে হঠাৎ এক হাজার টাকা চুরি যায় এবং বহু অনুসন্ধানেও সে চুরির কিনারা হইল না। সুতরাং হেমেন্দ্রবাবুর গচ্ছিত টাকা হইতে রেল কোম্পানি উক্ত হাজার টাকা কাটিয়া লন। গচ্ছিত টাকা রজনীবাবু দিয়াছিলেন, সুতরাং অপরের অর্থ এরূপভাবে নষ্ট হওয়াতে হেমেন্দ্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পীড়িত হইয়া পড়েন এবং এই পীড়াতেই তাঁহার জীবনান্ত হইল।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রথা আছে যে, শ্রাদ্ধের দিন অন্ন ও নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্যাদি সন্ধ্যার পরে বাটীর নিকটস্থ নির্জন স্থানে অনাবৃত অবস্থায় প্রেতের ভোগের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। বিশ্বাস যে, প্রেত আসিয়া এই সকল গ্রহণপূর্বক তৃপ্ত হয়।

হেমেন্দ্রবাবুর শ্রাদ্ধের দিবসও যথারীতি অন্নাদি রাখিয়া দেওয়া হইল। রাখিবার কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, ভোজ্যদ্রব্যের নিকট কে যেন দাঁড়াইয়া আছে।

সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, হেমেন্দ্রনাথ ধীর, স্থির ও গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া। সকলে এই দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করিলেন। কেহ বলিলেন— আরও

নিকটে যাওয়া যাক্। কেহ বলিলেন— ডাকিয়া দেখা যাক্, কোনো কথা কয় কিনা কিম্বা ওর কিছু বলিবার আছে কিনা?

কিন্তু প্রাচীনেরা নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, প্রেতের তৃপ্তির জন্য আহার, সুতরাং এ সময়ে কোনোরূপ বাধা বা বিরক্তি উৎপাদন করা উচিত নয়।

অনেকে অনেকরূপ ভালো মন্দ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রাচীনেরা বলিলেন যে, প্রেত যখন নিজ তৃপ্তির জন্য ভোজ্যদ্রব্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ইহা শুভ, কেননা ইহার দ্বারা প্রেতের তৃপ্তি হইবে বুঝা যায়।

কিয়ৎক্ষণ পরে বোধ হইল যেন, সে হাত নাড়িয়া কাহাকে ডাকিতেছে। লক্ষ করিয়া বোধ হইল যে, সে রজনীবাবুকেই ডাকিতেছে। ইহার পরেই অদৃশ্য হইয়া গেল।

উক্ত ঘটনার প্রায় এক মাস পরেই রজনীবাবু হঠাৎ পীড়িত হইয়া দেহান্তর লাভ করিলেন।

রজনীবাবুর শ্রাদ্ধের দিবসও যথারীতি অন্নব্যঞ্জনাদি বাটীর বাহিরে প্রেতের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইল। এবার পূর্বের ঘটনার জন্য অনেকেই কৌতূহল থাকায় প্রেতের দর্শনোদ্দেশ্যে প্রতীক্ষা করিয়াছিল।

এবারও ছায়া মূর্তি জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। ভোজ্য দ্রব্যের সম্মুখে রজনীবাবু ও তৎপার্শ্বে হেমেন্দ্রবাবু দাঁড়াইয়া। আত্মীয় স্বজনে বিহ্বল ও শোকাকুল দৃষ্টিতে মূর্তি দ্বয়কে দেখিতে দেখিতে কিয়ৎক্ষণ পরেই মূর্তিদ্বয় অদৃশ্য হইয়া গেল।

এবারে কাহাকেও আহ্বান বা ডাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে দেখা যায় নাই এবং ইহার অল্প দিন মধ্যে পরিবারবর্গ বা আত্মীয়গণের কাহারো মৃত্যু ঘটে নাই।'— অলৌকিক রহস্য, ১৩২২, জ্যৈষ্ঠ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বর্ণিত ভৌতিক কাহিনী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণিত এই ভৌতিক কাহিনীটি ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত "অলৌকিক রহস্য" পত্রিকার ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যায় (১৩১৬ মাঘ) প্রকাশিত হয়েছিল। "অলৌকিক রহস্য" থেকে ব্রজেনবাবুর লেখাটি এখানে হুবহু মুদ্রিত করছি·.

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বহু ভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গাজীপুর নিবাসী এক আত্মীয়ের বাড়িতে প্রেত-লীলার যে এক অলৌকিক ঘটনা কিছুদিন ধরিয়া সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ 'অলৌকিক রহস্যের' পাঠক-পাঠিকাদিগের আজ উপহার দিলাম।

অমূল্যবাবুর ভগ্নীপতি গাজীপুর মাচ্ছারহাটা নিবাসী ঁভোলানাথ মিত্র মহাশয়ের বাটী, এই লীলার সংযোগস্থল হইয়াছিল। তিনি opium department (ওপিয়াম ডিপার্টমেণ্ট) এর তৎকালীন Head inspector (হেড ইন্‌স্পেক্টর) ছিলেন। রাত্রি ১২টা পর্যন্ত তাঁহার গৃহে কোনো উৎপাতের সূচনা বা অনুষ্ঠান হইত না। কিন্তু ঠিক ১২টা বাজিলেই ছাদের ছোট ছোট আলিসার উপর বামনাকৃতি অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেকে লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়াইতে দেখা যাইত। বাড়িতে নিত্য এই ঘটনা ঘটিত। 'অলৌকিক' উৎপাত বলিয়া কেহ ও বিষয়ে তেমন একটা বিশেষ লক্ষ করিত না। নিত্যকার এই ঘটনার সহিত আর একটা উপসর্গিক ঘটনার আবির্ভাবে সময়ে সময়ে সেই গৃহস্থিত নবপ্রসূতির প্রসূত সন্তানের জীবননাশ ঘটিত। প্রসবের পর প্রসূতির আঁতুড় ঘরের নিকট উক্ত দ্বিপ্রহরের সময় এক বিকট প্রেতমূর্তি আবির্ভূত হইয়া প্রসূতির নিকট হইতে সন্তান চাহিত। ভয়ে প্রসূতি ছেলেকে কোলে টানিয়া লইতেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই বিকট মূর্তির বিকট অঙ্গ ভঙ্গি দেখিতে ভয়ে বিরত থাকিতেন। তথাপি সেই মূর্তি ছাড়িত না। নানারূপ অনৈসর্গিক ভয় প্রদর্শন ও নানা বিকট মূর্তি পরিগ্রহণ করিয়া প্রসূতির নিকট হইতে ছেলে লইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত।

অমূল্যবাবুর ভগিনীর কোনো আত্মীয়ার প্রতি, প্রসবগৃহের তত্ত্বাবধানের ভার পড়িয়াছে। একদিন উক্ত প্রেতযোনির ভীতি প্রদর্শনে একবার আত্মহারা হইয়া সদ্যপ্রসূত সন্তানকে সাবধানে রাখিতে গেলে হঠাৎ সে সন্তান ক্রোড়চ্যুত হয়। সঙ্গে সঙ্গে রক্ষাকর্ত্রী ভয়ে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিতা হন। ক্রোড়চ্যুত হওয়াতেই সেই সদ্যপ্রসূত

সন্তানের প্রাণ বিয়োগ হয়। তৎপর প্রেতমূর্তিও কিছুদিনের মতো অন্তর্হিত হইয়াছিল।

এই ঘটনার পর হইতে সেই বাটীর কোনো প্রসূতিরই সন্তানের জীবন রক্ষা হইত না। যাহা হউক, ইহার কিছুদিন পরে নিম্ন লিখিত ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল। উক্ত বাটীর কর্তা ৺ভোলানাথবাবুর পত্নী একজন সাহসী ও ধর্মপরায়ণা রমণী। এক সময় তাঁহার কন্যা, সন্তান প্রসব করিলেন। প্রসূতির প্রসবগৃহে সন্তানের রক্ষাকল্পে নব প্রসূতির সহিত তিনি রাত্রি যাপন করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। সারারাত্রি তিনি সদ্যজাত সন্তান ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া থাকিলেন। ঠিক দ্বিপ্রহরে, যখন সে ছেলে লইবার জন্য নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন তিনি অতীব ক্রোধব্যাকুল স্বরে সেই প্রেতমূর্তির সহিত কথা কহিতে ও বিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রেতের ভয় প্রদর্শনোপযোগী বিকট প্রেতলীলা তাঁহাকে সামান্য মাত্র ভীত বা বিচলিত করিতে সক্ষম হইল না। এইরূপ ২।৩ রাত্রি প্রেতমূর্তির সহিত বিবাদ করিবার সময় বলিলেন— যদি পুনর্বার তুই আমার সম্মুখে আসিস্ বা শীঘ্র এখান হইতে সরিয়া না যাস্ তবে এখনই তোকে ঝাঁটিয়ে তোর বিষ ঝাড়ব। এই বলিয়া পার্শ্বস্থ সম্মার্জনী উত্তোলন পূর্বক প্রেতমূর্তি লক্ষ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ইহার পর হইতে আর সে প্রেতমূর্তি দেখা যাইত না। আর কখনও সে বাটীতে সেই প্রেতমূর্তি সদ্যপ্রসূত শিশু চাহিতে আসিত না।[১]

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
'জাহ্নবী' কার্যালয়
৬৬ নং মাণিকতলা স্ট্রিট

কলিকাতা
১৪ই কার্ত্তিক, ১৩১৬

১. বলা বাহুল্য অমূল্যবাবু এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

কিশোরীচাঁদের জানা ভৌতিক কাহিনী

কিশোরীচাঁদ মিত্র ছিলেন 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের লেখক টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনিও একজন সাহিত্য সেবক ছিলেন। এঁর রামমোহন রায় শীর্ষক লেখা পড়ে ছোটলাট এঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে দেন। ইনি 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' ইংরাজি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কিশোরীচাঁদ ছিলেন 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রথম বাঙালি লেখক।

এই কিশোরীচাঁদের একমাত্র কন্যা এক অশরীরী মেম সাহেবের দ্বারা আশ্চর্যভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। কিশোরীচাঁদ পরে একসময় ওই অশরীরী মেম সাহেবের কথা মেম সাহেবেরই পিতার মুখ থেকে শুনে ছিলেন। শুনে সেকথা তাঁর বাড়ির লোকদের এবং নিকট আত্মীয়স্বজনের কাছে বলেছিলেন।

কিশোরীচাঁদের এক আত্মীয়া সুধীরা বসু ১৫. ৪. ১৯৫৪ তারিখের যুগান্তর সাময়িকীতে 'অশরীরী মেম সাহেব' নাম দিয়ে এই কাহিনীটি লিখেছিলেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে তখনকার কলকাতার সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র ইন্টারপ্রিটার জর্জ এলিয়ট নামক সাহেবের কাছ থেকে তাঁর ১নং দমদম রোডের বাড়িটি কেনেন।

কিশোরীচাঁদের এক কন্যা ব্যতীত তাঁর আর কোনো সন্তান ছিল না। কন্যার নাম ছিল কুমুদিনী। কুমুদিনীর বিবাহ হয় নীলমণি দে-র সঙ্গে।

কুমুদিনী পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন বলে, বিবাহের পরও স্বামীর সঙ্গে পিত্রালয়ে ১নং দমদম রোডের বাড়িতেই থাকতেন।

যে সময়কার ঘটনা বলা হচ্ছে, তখন কুমুদিনীর বয়স অল্প, একটি সন্তানের জননী।

কুমুদিনী বই পড়তে খুব ভালোবাসতেন। অনেক রাত পর্যন্ত জেগেও বই পড়তেন। একরাত্রে তিনি একলা একটি ঘরে শুয়ে মাথার কাছে তেলের বাতি জ্বেলে বই পড়ছিলেন। তখন বৈদ্যুতিক আলো হয়নি।

কুমুদিনী যে ঘরে শুয়ে বই পড়ছিলেন, তার পাশের ঘরে তাঁর বাবা, মা ও শিশুপুত্র ঘুমুচ্ছিলেন। তাঁর স্বামী সেদিন স্থানান্তরে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ছিলেন না।

বই পড়তে পড়তে কুমুদিনী ঘুমিয়ে পড়েন। এই সময় বাতাসে মশারি উড়ে বাতির উপর পড়লে মশারি ধরে যায় এবং দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

সেই সময় অকস্মাৎ কার হিমশীতল কর স্পর্শের মৃদু ধাক্কায় কুমুদিনী চোখ মেলে দেখেন, একটি তরুণী মেম সাহেব তাঁকে ধাক্কা দিচ্ছেন। কিন্তু অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কুমুদিনী লক্ষ করেছিলেন, সেই মেম সাহেবের গায়ে গোলাপি রঙের পোশাক ছিল।

কুমুদিনীর চিৎকারে তাঁর বাবা মা ছুটে আসেন এবং আগুন নেভান।

এটা ঠিক যে, ওই সময়ে সেই মেম সাহেবটি যদি কুমুদিনীকে না জাগাতেন, তাহলে কুমুদিনী নিশ্চয়ই পুড়ে মরতেন।

কুমুদিনীর মুখে মেম সাহেবের ধাক্কা দেওয়ার কথা শুনে, তাঁর বাবা মা বিস্ময়ান্বিত হলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, কিশোরীচাঁদ যে সাহেবের কাছ থেকে ১নং দমদম রোডের বাটী কিনেছিলেন, সেই জর্জ এলিয়ট সাহেব একদিন ওই বাড়িতে আসেন। সাহেব এসে কিশোরীচাঁদকে বললেন— চিরকালের জন্য ভারতবর্ষ ছেড়ে স্বদেশে চলে যাচ্ছি। যাবার আগে আমার বাড়িটা একবার দেখবার ইচ্ছা হ'ল। তাই বাড়িটা একবার দেখতে এলাম।

সাহেব কিশোরীচাঁদকে আরও বললেন— এই বাড়ির দুতলায় একটা ঘরে আমার একমাত্র কন্যা একরাত্রে রাত জেগে শুয়ে বই পড়ছিল। বই পড়তে পড়তে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ে। মাথার কাছে বাতি জ্বলছিল। বাতাসে মশারি এসে সেই বাতিতে পড়ে। ফলে মশারি এবং বিছানায় আগুন লাগায়, সেই আগুনে আমার কন্যাটি মারা যায়। তাই ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার আগে এই বিষাদস্মৃতি জড়িত বাড়িটি এবং আমার কন্যা যে ঘরে মারা যায়, সেই ঘরটিও একবার দেখতে এসেছি।

সাহেব দোতলায় গিয়ে যে ঘরে তাঁর কন্যা আগুনে পুড়ে মারা যায় বলে দেখালেন, কিশোরীচাঁদ দেখলেন, ঠিক ওই ঘরেই তাঁর কন্যা কুমুদিনী পুড়ে মরতে মরতে কোনো রকমে রক্ষা পায়। কিশোরীচাঁদ সাহেবের মুখে ওই ঘরেই তাঁর কন্যার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল শুনে বিস্মিত হয়ে গেলেন। বিস্মিত কিশোরীচাঁদ তখন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন— মৃত্যুর সময় আপনার কন্যার গায়ে কী রঙের পোশাক ছিল?

সাহেব কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বললেন— তাঁর কন্যা সে রাত্রে গোলাপি রংয়ের রাত্রির পোশাক পরে শুয়েছিল। মৃত্যুর পর তাকে কফিনে করে দুদিন এই ঘরে রাখা হয়েছিল।

সব শুনে শেষে কিশোরীচাঁদ এই ঘরেই তাঁরও কন্যার মশারির আগুন লাগার কথা এবং গোলাপি রং-এর পোশাক পরা এক মেমসাহেব কীভাবে তাঁর কন্যাকে আগুনের হাত থেকে অর্থাৎ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান সেকথা সাহেবকে বললেন।

তখন সাহেব, কিশোরীচাঁদ এবং আরও যাঁরা তখন ওই ঘরে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বুঝলেন— সাহেবের কন্যা আগুনে পুড়ে যে যন্ত্রণা নিয়ে মারা যান, যাতে আর কেহ না সে যন্ত্রণা পান বা মারা যান, তারই জন্য সে রাত্রে ওই সাহের কন্যার অশরীরী আত্মা এসে কুমুদিনীকে বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

এরপর কত বছর কেটে গেল, ১নং দমদম রোডের বাড়ি যেমন ছিল, তেমনি আছে। কিন্তু আর কেউই কোনো দিন সেই অশরীরী মেম সাহেবকে দেখেন নি।

সুধীরা দেবী তাঁর প্রবন্ধের শেষে ওই অশরীরী মেম সাহেব সম্বন্ধে লিখেছেন— "কুমুদিনীকে রক্ষা করিবার জন্যই হয়তো সে ক্ষণিকের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল এবং এই কর্তব্য সাধনের পরেই সে শ্রীভগবানের চরণে বিলীন হইয়া গিয়েছিল।

গিরিশচন্দ্রের দেখা ব্রহ্মদৈত্য

গিরিশচন্দ্র ঘোষের “অশোক” নাটকখানি ১৩১৭ সালে সর্বপ্রথম মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই নাটক অভিনয়ের পূর্বে রিহারসালের সময় যে ভৌতিক ঘটনা ঘটেছিল, সেই কাহিনীটিই এখানে বলছি :

তখন আষাঢ় মাস। সেদিন সন্ধ্যা তখন অনেকক্ষণই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মঞ্চের একপাশে কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী বসে গল্প করছেন, অপরপাশে একটু আড়ালে অর্গান বাজিয়ে নাটকের গানের সুরকার দেবকণ্ঠ বাগচী একটি গানে সুর দিচ্ছেন। দেবকণ্ঠবাবুর পাশের একটি ঘরে গিরিশচন্দ্র গড়গড়ার নলে মুখ দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে দেবকণ্ঠবাবুর গান শুনছেন।

দেবকণ্ঠবাবু গানে সুর দিচ্ছেন বটে, কিন্তু কোনো সুরটাই তাঁর মনের মতো হচ্ছে না।

এমন সময় উপবীতধারী সুদর্শন এক পুরুষ দেবকণ্ঠবাবুর কাছে এসে বললেন— বাগচী মশায়! হ'ল না তো, আচ্ছা, এ সুরটা কেমন হয় শুনুন তো— বলে তিনি একটা সুর দিয়ে সেই গানটা গাইলেন।

ব্রাহ্মণের মুখে গান শুনে দেবকণ্ঠবাবু একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

গানে মুগ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রও পাশের ঘর থেকে দেবকণ্ঠবাবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন— কে গাইল হে!

দেবকণ্ঠবাবু গিরিশচন্দ্রের কথার উত্তরে বললেন— এঁকে চিনি না। ইনি এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ।

এরপর দেবকণ্ঠবাবু সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণের পরিচয় জানতে চাইলেন।

উত্তরে ব্রাহ্মণ বললেন— পরিচয় জেনে কি লাভ! আপনি গান করুন।— এই বলেই ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এদিকে গিরিশচন্দ্র ততক্ষণে মঞ্চে দেবকণ্ঠবাবুর কাছে এসে গেলেন। তিনি এলে দেবকণ্ঠবাবু তাঁকে ব্রাহ্মণের অদৃশ্য হওয়ার কথা বললেন।

শুনে গিরিশচন্দ্র বললেন— তাইত, এযে বড় অলৌকিক কাণ্ড ঘটল হে!

দিনকয়েক পরে, একদিন ওই গানটির আবার মহড়া চলছে। সেদিন মঞ্চে দেবকণ্ঠবাবু

ও গিরিশচন্দ্র উপস্থিত। সেই সময় পূর্বোক্ত সেই দিব্যকান্তি ব্রাহ্মণ পুনরায় মঞ্চে উপস্থিত হয়ে দেবকণ্ঠবাবুকে বললেন— গানটা এখনও ঠিক হচ্ছে না— বলে তিনি কয়েক জায়গায় সংশোধন করে দিলেন।

গান শেষ হলে এবার গিরিশচন্দ্র সেই আগন্তুককে বললেন— অপূর্ব আপনার সুরজ্ঞান। আপনি কে, আপনার পরিচয় দিলে আমরা বড়ই আনন্দিত হব।

তখন আগন্তুক বললেন— আমি মহারাজ নন্দকুমারের পৌত্র। জীবিতকালে সংগীতের চর্চা করতাম। বহুদিন হ'ল দেহত্যাগ করেছি। এই থিয়েটার ভবনের পাশেই আমার বাড়ি ছিল। ভুল সুর শুনে থাকতে না পেরে এসেছিলাম। এখন আমি ব্রহ্মদৈত্য হয়ে ওই বেলগাছটায় থাকি। তবে ভয় নেই, আমি কারও ক্ষতি করি না।— এই বলেই সে বিদেহী আত্মা অদৃশ্য হয়ে গেল।

গিরিশচন্দ্র ও দেবকণ্ঠবাবু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন।

এই কাহিনীটি যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর "মরণের পরে" গ্রন্থে "মিনার্ভা থিয়েটারে ব্রহ্মদৈত্য' নাম দিয়ে লিখেছেন। দেবকণ্ঠ বাগচীর পুত্র তারকনাথ বাগচীর কাছে যোগেনবাবু এই কাহিনীটি শুনেছিলেন। তারকনাথ বাগচী তাঁর পিতার মুখে এবং গিরিশচন্দ্রের মুখে এই কাহিনীটি শোনেন। শুনে তিনি একটি পত্রিকায় এই কাহিনীটি লিখেওছিলেন। যোগেনবাবু তারকবাবুর লেখাটিও পড়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের রোগমুক্তি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার হঠাৎ পেটে একটা দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করেন। সেই যন্ত্রণা মুহূর্ত মধ্যেই এমনই তীব্র হয়ে উঠে যে, তার ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার এসে ওষুধপত্র দিয়ে যন্ত্রণার কিছুটা উপশম করালেন। ক্রমে অবনীন্দ্রনাথের জ্ঞানও ফিরে এল।

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথের যন্ত্রণার কিছুটা উপশম করালেও যন্ত্রণা একেবারে দূর করতে পারলেন না। অবনীন্দ্রনাথ যন্ত্রণায় বেশ কয়েকদিন ভুগলেন।

সকালের দিকে যন্ত্রণা একটু কম থাকত বটে, কিন্তু বিকাল হলেই যন্ত্রণা আবার বাড়ত। বিকালের সেই যন্ত্রণা সারা রাত থাকত। তারপর ভোরের দিকে একটু একটু করে কমত।

অবনীন্দ্রনাথকে রোগমুক্ত করবার জন্য দেশীয় এবং ইউরোপীয় করে চার চারজন ডাক্তার ডাকা হয়। তাঁরা একত্রে পরামর্শ করে ওষুধ দিলেন, কিন্তু তবুও বিকালের যন্ত্রণা আর কমল না।

সেদিন বিকালের যন্ত্রণাটা একটু বেশি রকম দেখা দিলে অবনীন্দ্রনাথ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ডাক্তারদের বললেন— আমার ঘুমাবার একটু ব্যবস্থা করে দিন।

তখন ডাক্তাররা একটা একটা করে দু দুটা মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌শান দিলেন। কিন্তু কিছুই কাজ হ'ল না। তিনি তেমনি যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন। ডাক্তাররা ওষুধ পত্র নিয়ে ব্যর্থই চেষ্টা করতে লাগলেন।

ক্রমে অনেকটা রাত হয়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথ তখন নিজেই ডাক্তারদের বাড়ি যেতে বললেন। আর তিনি তাঁর বাড়ির লোকজনদেরও বললেন— তোমরা আমার সঙ্গে সারারাত জেগে থেকে আর কী করবে? তোমরা শোওগে। আমি একাই থাকি। এই বলে তিনি একরূপ জোর করেই সকলকে তাঁর ঘর থেকে চলে যেতে বললেন।

অগত্যা বাড়ির সকলে অবনীন্দ্রনাথের ঘর ছেড়ে আশেপাশেই শুলেন। উপর্যুপরি ক'রাত্রি জাগার দরুণ তাঁরাও শোওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে কেবল অবনীন্দ্রনাথের চোখে ঘুম নেই। তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণা ভোগ করছেন।

রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। এমন সময় যন্ত্রণাকাতর অবনীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন— তাঁর মা যেন কাছে এসে বলছেন, কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। এই বলে, তিনি অবনীন্দ্রনাথের পেটে যন্ত্রণার জায়গায় হাত বুলিয়ে দিলেন। অমনি জাদুমন্ত্রের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গেই

যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তখনই তাঁর মনে হ'ল— মা তো অনেকদিন আগেই মারা গেছেন! এ কি করে সম্ভব হল?

তখন তিনি সবদিকে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু কাকেও কোথাও দেখতে পেলেন না।

বিস্মিত অবনীন্দ্রনাথ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করে বাইরে এসে দেখলেন, সামনেই দরজার কাছে তাঁর ভৃত্যটি শুয়ে আছে। তিনি তাকে ডেকে এক গ্লাস জল দিতে বললেন।

ভৃত্য জল দিলে, তিনি চোখে মুখে বেশ করে জল দিলেন।

তারপর ভৃত্যকে চা তৈরি করতে বললেন।

ভৃত্য চা দিলে, এবার তাকে তামাক সেজে দিতে বললেন।

ভৃত্য তামাক সেজে দিলে তিনি বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়ে ধূমপান করতে লাগলেন।

ভৃত্য তার প্রভুকে যন্ত্রণার কথা জিজ্ঞাসা করলে, প্রভু বললেন— যন্ত্রণা সেরে গেছে।

— এদিকে ক্রমে ভোর হয়ে এল। ওই সময় অবনীন্দ্রনাথের স্ত্রী ও দুই কন্যা অবনীন্দ্রনাথের ঘরে আসতে গিয়ে দেখেন, তিনি দিব্যি বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে গড়গড়ায় তামাক টানছেন।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের দেখেই আনন্দে বলে উঠলেন— যন্ত্রণা একেবারেই সেরে গেছে।— এই বলে তিনি তাঁর আরোগ্য হওয়ার অলৌকিক কাহিনীটি বললেন।

অবনীন্দ্রনাথের কথা শুনে সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

অবনীন্দ্রনাথ পরে তাঁর জীবন কাহিনীর শ্রুতি-লেখিকা রানি চন্দকে এই কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন :

...সমস্ত শরীরটা যেন চমকে উঠল, ভালো করে চারদিকে তাকালুম, কেউ কোথাও নেই। ব্যথা? নড়েচড়ে দেখি তাও নেই। অসাড় হয়ে শুয়েছিলাম, নড়বার শক্তিটুকু ছিল না, একটু আগে। সেই আমি বিছানায় উঠে বসলুম। কি বলব, নিজের মনে কেমন অবাক লাগল।

সৌরীন্দ্রমোহনের স্বপ্ন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এরা দুজনে বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। এঁরা উভয়ে কিছুদিন "ভারতী" পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদকও হয়েছিলেন।

মণিলালবাবু এবং সৌরীন্দ্রবাবু এঁরা দুজনেই এক সময় পরলোকতত্ত্ব নিয়ে চর্চা করতে খুব পছন্দ করতেন। তখন এঁরা প্রায় চক্রে বসে প্ল্যান্‌চেট প্রভৃতির সাহায্যে মৃত ব্যক্তিদের সহিত আলাপ পরিচয় করতেন। চক্রে এঁদের সঙ্গে বসতেন, এঁদের সাহিত্যিক বন্ধুরাই। যেমন— চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। এঁরা তখনই একবার চক্রে বসে জানতে পেরেছিলেন— অজিতবাবু আর বেশিদিন বাঁচবেন না।— চক্রের সেকথা নির্মমভাবে সত্য হয়েছিল।

মণিলালবাবু ও সৌরীন্দ্রবাবু শুধু চক্রে বসেই ভৌতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতেন না। এঁরা দুজনেই পরে অনেক ভূতের গল্পও রচনা করেন।

সৌরীন্দ্রবাবু অনেকগুলি ভূতের গল্পের বই রচনা করেছেন। তাঁর "পরলোকের গল্প" বইটিতে তিনি তাঁর নিজের জীবনের কতকগুলি ভৌতিক অভিজ্ঞতার কাহিনীও লিখেছেন। এই বইটিতে তিনি তার বন্ধু মণিলালবাবুর মৃত্যু সম্পর্কিত একটি কাহিনী বলেছেন। সে কাহিনীটি এই :

মণিলালবাবু তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের নিকট জোড়াসাঁকোতেই থাকতেন।

মণিলালবাবুর সেবার কঠিন নিউমোনিয়া হয়। সারার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। সকলেই একরূপ তাঁর আশা ছেড়ে দিলেন। সৌরীন্দ্রবাবু ওই সময় কলকাতায় ওকালতি করতেন। তিনি প্রতিদিন কোর্ট থেকে সিধা জোড়াসাঁকোয় বন্ধু মণিলালকে দেখতে যেতেন।

সেদিন সৌরীন্দ্রবাবু গিয়ে দেখলেন— মণিলালবাবুর নাভিশ্বাস উঠেছে। এখন যায়, তখন যায়, অবস্থা।

রাত্রি প্রায় দশটা হয়ে গেল। এমন সময় অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা সৌরীন্দ্রবাবুকে বললেন— কোর্ট থেকে সিধা এসেছেন। এই ভাবে কোর্টের পোশাক পরে আর কতক্ষণ থাকবেন! বরং বাড়ি গিয়ে এ সব ছেড়ে খেয়ে দেয়ে আসবেন চলুন। আমি আপনাকে মোটরে করে পৌঁছে দিচ্ছি।

সৌরীন্দ্রবাবুর বাড়ি ফিরে খেতে খেতেই রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। খেয়ে একটু শুতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। সৌরীন্দ্রবাবু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন— তাঁর বাড়িতে মণিলালবাবু যেন এসে, সিঁড়ি থেকে তাঁকে সৌরীন, সৌরীন, করে ডাকছেন।

ডাক শুনে তিনি বন্ধুর কাছে এসে বললেন— এস, বসবে এস।

উত্তরে মণিলালবাবু বললেন— না, বসব না। কিছুই ভালো লাগছে না। আমি পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছি, তাই যাবার সময় তোমাকে জানিয়ে যেতে এলাম।

সৌরীন্দ্রবাবু যে সময় এই স্বপ্নটি দেখেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁর ঘরের বাইরে থেকে, তাঁর ভৃত্য কড়া নেড়ে ডাকতে থাকে।

সৌরীন্দ্রবাবুর স্ত্রী জেগে ছিলেন। তিনি কপাট খুলে দিলেন। সৌরীন্দ্রবাবুও উঠে পড়লেন।

ভৃত্য সৌরীন্দ্রবাবুকে বললে— মণিলালবাবুর বাড়ি থেকে একজন লোক এসেছেন। নীচে অপেক্ষা করছেন।

সৌরীন্দ্রবাবু নীচে গিয়ে লোকটির মুখে শুনলেন, কিছু আগেই মণিলালবাবু মারা গেছেন।

সৌরীন্দ্রবাবু এখনি জোড়াসাঁকোয় যাচ্ছি বলে, লোকটিকে বিদায় দিয়ে উপরে এলে তাঁর স্ত্রী, ব্যাপার কী, জিজ্ঞাসা করলেন।

সৌরীন্দ্রবাবু স্ত্রীকে মণিলালবাবুর মৃত্যুর সংবাদ শোনালে তাঁর স্ত্রী তখন বললেন যে, ভৃত্যকে কপাট খুলে দেবার আগে তিনি ঘুমের ঘোরে সিঁড়িতে মণিলালবাবুর গলার ডাক শুনতে পান।

সৌরীন্দ্রবাবু যে বাড়িটাতে থাকতেন, সে বাড়িটা তিনতলা ছিল। সৌরীন্দ্রবাবু দুতলায় থাকতেন, আর তিনতলায় থাকতেন, তাঁর ছোট ভাই ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন। তিনি তখনই উপর থেকে নেমে এসে দাদাকে বললেন— আমি জেগে কাজ করছিলাম। আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম, মণিলালবাবু দুতলার সিঁড়ি থেকে আপনার নাম ধরে ডাকছেন। ভাবলাম, তিনি হয়ত সত্যিই এসেছেন এবং আপনিও জেগে আছেন।

সৌরীন্দ্রবাবু তাঁর স্ত্রী ও ছোট ভাই-এর কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন— আমি যে কথা স্বপ্নে শুনলাম, সে কথা এঁরা জেগে থেকে শুনলেন কী ভাবে! আশ্চর্য ঘটনা তো!

উপেন্দ্রনাথ বর্ণিত ভৌতিক কাহিনী

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন ভাগলপুরে ওকালতি করেন। সেই সময় ভাগলপুরের কমিশনারের পার্শন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, উপেনবাবুর প্রেসিডেন্সী কলেজের সহপাঠী অমরেন্দ্রনাথ দাস (ইনি কলকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ গোপেন্দ্রনাথ দাসের দাদা), ভাগলপুরের প্রেমসুন্দর বসু (ইনি পরে শান্তিনিকেতন কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন), ভাগলপুরে সদ্য আগত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষিতীশচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় উপেনবাবুর বৈঠকখানায় এসে আড্ডা জমাতেন।

বৈঠকখানার মেঝেয় ঢালা ফরাসের উপরেই সকলে এসে বসতেন। কেবল ক্ষিতীশবাবুই ফরাসে না বসে একটা চেয়ারে বসতেন। তিনি একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে অস্ত্রোপচারের ফলে একটা পায়ের শিরায় টান থেকে যাওয়ায় পা মুড়ে বসতে পারতেন না।

বৈঠকখানার আড্ডায় নানা বিষয়ের গল্প ও আলোচনা হ'ত এবং গানও হ'ত। গান কেবল উপেনবাবুই গাইতেন, অপর সকলে শুনতেন।

রবীন্দ্রনাথের "তোমায় যত শুনিয়ে ছিলেম গান" এই গানটি ক্ষিতীশবাবুর বড় প্রিয় ছিল। ক্ষিতীশবাবুর অনুরোধে উপেনবাবুকে রোজই অন্তত একবার করেও এই গানটা গাইতেই হ'ত।

এইভাবেই উপেনবাবুদের সান্ধ্য বৈঠক বেশ চলে আসছিল। এমন সময় অকস্মাৎ একদিন ক্ষিতীশবাবুর মৃত্যু হ'ল। তিনি টম্‌টম্‌ ও তৎসহ ঘোড়া কিনবার জন্য নিজে টম্‌টম্‌ পরীক্ষা করে যখন দেখছিলেন, সেই সময় ঘোড়া হঠাৎ ভয় পেয়ে বিগড়ে গিয়ে অসামাল হওয়ায় গাড়ি উলটে পড়ে। তাতে ক্ষিতীশবাবুর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। সেই আঘাতের ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ক্ষিতীশবাবুদের বাড়ি ছিল মজঃফরপুরে। ক্ষিতীশবাবুর মৃত্যুর পরেই দাদা সুরেন্দ্রনাথ সেন ক্ষিতীশবাবুর পরিবারবর্গকে মজঃফরপুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভাগলপুরে আসেন। গোছগাছ করতে তিন চারদিন দেরি হয়ে যায়। তাঁদের যাবার আগের দিন উপেনবাবুদের দলের অমরেন্দ্রনাথ দাস সুরেনবাবুকে বললেন— দেখুন সুরেনবাবু, ভাইয়ে ভাইয়ে মুখের মিল আমরা অনেক দেখেছি, সেই হিসাবে আপনার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষিতীশবাবুর মুখের মিল দেখে আমরা ততটা বিস্মিত হয়নি, কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে

কণ্ঠস্বরেও যে এতটা মিল হতে পারে, তা আগে জানতাম না। আপনি কথা বললে, মনে হয় যেন আমাদের বন্ধু ক্ষিতীশবাবুই কথা বলছেন। আপনি অনুগ্রহ করে আজ যদি উপেনবাবুর বাড়িতে আমাদের সান্ধ্য বৈঠকে একবার আসেন, তাহলে আমরা আপনাকে পেয়ে, ক্ষিতীশবাবুকে পেয়েছি, এটা অন্তত কিছুক্ষণের জন্য মনে করতে পারব।

সুরেনবাবু শুনে বললেন— আমি জানি, ক্ষিতীশ আপনাদের কীরূপ বন্ধু ছিল! তা নিশ্চয়ই আমি আজ আপনাদের বৈঠকে যাব।

সন্ধ্যার পর যথা সময়ে সুরেনবাবু উপেনবাবুর বাড়িতে এলেন।

সেরাত্রে সকলে মিলে কেবল ক্ষিতীশবাবুর কথাই আলোচনা করতে লাগলেন। এমন সময় অমরবাবু বলে উঠলেন— উপেনবাবু, আজ যখন বিশেষভাবে ক্ষিতীশবাবুর কথাই এই সভায় আলোচনা হচ্ছে, তখন আপনি যদি তাঁর সেই প্রিয় গানটি একবার গান করেন, আমাদের মনে হয়, তাহলে ক্ষিতীশবাবুর আত্মা শান্তি পেতে পারে।

অমরবাবুর কথা সভার সকলেই সমর্থন করলেন। তখন উপেনবাবু গানটি ধরলেন। গানের কিছুটা গেয়েছেন, এমন সময় সকলেই দেখতে পেলেন, ঘরের সেই শূন্য চেয়ারটিতে যেটিতে ক্ষিতীশবাবু প্রতিদিন এসে বসতেন, ক্ষিতীশবাবু সশরীরে এসে বসে আছেন। একমাত্র সুরেনবাবু শুধু দেখতে পেলেন না, কারণ তিনি চেয়ারটির দিকে পিছন করে বসেছিলেন।

মৃত ক্ষিতীশবাবুর এই মূর্তি দেখা সম্বন্ধে উপেনবাবু নিজেই তাঁর "স্মৃতিকথা" গ্রন্থে লিখে গেছেন :

এমন সময় অমরবাবুর কম্পিত মোটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, উ-উপেন বা-আবু।

আমি উত্তর দিলাম— হুঁ। অর্থাৎ আমিও দেখেছি।

দেখেছি, ঘরের নৈর্ঋত কোণে রক্ষিত বেতের ইজি চেয়ারের উপর কখন সশরীরে এসে নিঃশব্দে বসেছেন ক্ষিতীশচন্দ্র। এক লহমার জন্য অবশ্য, কিন্তু সেজন্য সাদৃশ্য বোধের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি— একেবারে সুস্পষ্ট, কঠিন, নিটোল (Solid) ক্ষিতীশবাবু— ছায়া নয়, মায়া নয়, ভ্রান্তি নয়। তেমনি আগেকার মতো পায়ের উপর পা দিয়ে ডান হাতের ছড়িটি পায়ের উপর রেখে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে মৃদু মৃদু হাসছেন। 'সশরীরে' প্রকাশ বলতে যদি কিছু বোঝায় তাহলে একান্তভাবে তাই।

মৃত ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের মূর্তি দেখা ছাড়াও উপেনবাবু তাঁর "স্মৃতিকথায়" আরও দুটি ভৌতিক কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। এই দুটির একটি তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ করা, অপরটি তাঁর মাতা-ঠাকুরানি ও মেজদার কাছে শোনা। তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ করা কাহিনীটি এই :

উপেনবাবুরা তখন কলকাতায় ভবানীপুরে কাঁশারী পাড়া রোডে একটা বাড়িতে থাকেন। সেরাত্রে উপেনবাবুর মা'র তাল নবমীর ব্রত উদ্‌যাপনের ২০।২৫ জন ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে।

ব্রাহ্মণরা সকলেই এসেছেন। এমন সময় তাঁদের মধ্য থেকে একজন বললেন— এ বাড়িতে ভূত আছে।

শুনে উপস্থিত কেউ কেউ বললেন— আপনি কী করে জানলেন?

তিনি বললেন— আমরা আগে এ বাড়িতে থাকতাম। সেই জন্যই জানি। ভূতের ব্যাপারটা হচ্ছে এই— আমরা এ বাড়িতে থাকার আগে, যাঁরা থাকতেন তাঁদের একটি

বছর চারেকের ছেলে ছিল। মার্বেল ছিল, সেই ছেলেটির একমাত্র খেলার বস্তু। সে একাই আপন মনে তার মার্বেল নিয়ে ঘরের মেঝেতে গড়াত ও ছুঁড়ত। আমরা এই যে ঘরে বসে আছি, ঠিক এর মাথার উপর দুতলার ঘরটিতে, ছেলেটি তার বাপমার কাছে থাকত। সেই সময় ছেলেটি হঠাৎ কলেরায় মারা যায়। তারপর থেকে ছেলেটির আত্মা প্রতিদিনই রাত্রি ঠিক ১টার সময় ওই ঘরে একবার করে মার্বেল ছাড়ে। শক্ত মেঝের উপর শক্ত মার্বেল প'ড়ে তিন চার বার ঠক্ ঠক্ করে শব্দ করে।

শুনে উপেনবাবু বললেন— আমরা তো কই, কোনও দিন লক্ষ করিনি।

যিনি ভূতের কথা বলেছিলেন, তিনি এবার বললেন— আজই লক্ষ করুন, ঠিক ১টার সময় ওই শব্দ শুনতে পাবেন।

উপেনবাবু বললেন— আচ্ছা, আজই তবে পরীক্ষা করে দেখব।

এদিকে যথাসময়ে ব্রাহ্মণ-ভোজন সমাধা হ'লে সকলেই চলে গেলেন। উপেনবাবু এবার তাঁর বন্ধু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে রাত্রি ১টা পর্যন্ত কান খাড়া করে ওই ঘরে বসে রইলেন।

ঠিক রাত্রি ১টার সময় উপেনবাবু ও শ্যামাচরণবাবু উপরের ঘরের মেঝেয় মার্বেল পড়ার ওই তিন চার বার ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনতে পেলেন।

উপেনবাবু পরদিন সকালেই তাঁর দাদাকে ওই ভূতের কাহিনী শোনালেন।

শুনে তাঁর দাদা বললেন— এ কথা আর বাড়ির মেয়েদের শুনিও না। শব্দ হয় হোক্, সে তো আর আমাদের কোনো ক্ষতি করছে না। এই তো এতদিন কাটিয়ে দিলাম।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে উপেনবাবুর দাদা লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় জামাতা সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরে ইনি পাটনা হাইকোর্টের জজ হন) একবার দুচার দিনের জন্য কাঁশারী পাড়া রোডে শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন।

সুবোধবাবু একদিন রাত্রি একটা দেড়টার সময় ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন, একটি বছর চারেকের ছেলে বারান্দায় একধারে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর তিনি দেখলেন, ছেলেটি তখনই কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়ে গেল। এত রাত্রে বারান্দায় কে ঘুরছে, ভালো করে দেখবার জন্য সুবোধবাবু সেদিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি আবার দেখতে পেলেন, ছেলেটি একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

এই দেখে সুবোধবাবু খুবই বিস্মিত হলেন। তিনি তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেন, সব ঘরই অন্ধ এবং সকলেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন!

সুবোধবাবু পরদিন সকালে রাত্রির ওই ঘটনা তাঁর শ্বশুরমশায় ও উপেনবাবুকে বললেন।

লালমোহনবাবু ও উপেনবাবু শুনে ব্যাপারটা বুঝলেন এবং ওই ভৌতিক ইতিহাসটা তাঁরা সুবোধবাবুকে বললেন।

এরপর অবশ্য আর কেউই কোনোদিন ছেলেটিকে দেখেনি।

এবার উপেনবাবুর, তাঁর মাতাঠাকুরানি ও মেজদাদার নিকট শোনা কাহিনীটি বলছি। এ সম্বন্ধে উপেনবাবু নিজেই তাঁর স্মৃতিকথা গ্রন্থে এইরূপ লিখে গেছেন :

তখন আমরা পূর্ণিয়ায় থাকি। দুটি যমজ কন্যা প্রসব করার পর মাতাঠাকুরাণীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। পূর্ণিয়ায় যখন শারীরিক উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, তখন উন্নততর চিকিৎসা এবং বায়ু পরিবর্তনের জন্য তাঁকে ভাগলপুরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। যমজ মেয়ে দুটির লালন পালনের সুবিধার জন্য নিযুক্ত করা হ'ল একটি দুগ্ধবতী ধাত্রী।

কিছুকাল ভাগলপুরে অবস্থান করার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে মাতাঠাকুরানি মেজদাদার সহিত পূর্ণিয়ায় ফিরে চলেছেন। সাহেবগঞ্জ স্টেশনে প্রায় সমস্ত রাত্রিই অতিবাহিত করতে হবে। ভোর চারটের সময়ে ঘাটের গাড়ি ছাড়বে। সেই গাড়িতে আরোহণ করে সকরি ঘাটে এসে স্টিমারে গঙ্গা উত্তীর্ণ হয়ে মণিহারী ঘাটে পৌঁছে পূর্ণিয়ার রেল ধরতে হবে।

সাহেবগঞ্জ স্টেশনে ওয়েটিং রুমে মাতাঠাকুরানি ও মেজদাদা অপেক্ষা করছেন। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। মেজদাদার দেহে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে মাতাঠাকুরানি বললেন— রমণী, বড়ো খুকি মারা গেছে।

বড় খুকি অর্থে যমজ দুটি কন্যার মধ্যে বড়টি। চমকিত হয়ে মেজদাদা বললেন— সে কি কথা! তুমি কেমন করে জানলে?

মা বললেন— সে নিজে এসে আমাকে জানিয়ে গেল।

মেজদাদা বললেন— তুমি স্বপ্ন দেখেছ মা। ও কিছু নয়।

সবেগে মাথা নেড়ে মা বললেন— না, না, স্বপ্ন-টপ্ন ও সব কিছু নয়। আমি তখন জেগে ছিলাম। বড় খুকি এসে সহজ সুরে আমাকে বললে— মা, আমি তোমার বড় খুকি, এখনি মারা গেলাম। তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি।

বাড়ি পৌঁছে মেজদাদা দেখলেন, সাহেবগঞ্জ স্টেশনে মাতাঠাকুরানি তাঁকে যে কথা জানিয়েছিলেন স্বপ্নই হোক্ অথবা আর যে কোনো কারণেই হোক্— তা সম্পূর্ণ নির্ভুল। ঠিক তার আগের রাত্রে বারোটা আন্দাজ বড় খুকি হঠাৎ মারা গেছে। বিশেষ কোনো অসুখ বিসুখ করেনি। সকাল থেকে কয়েকবার বমি করেছিল, তারপর অকস্মাৎ মৃত্যু।

অসমঞ্জের দেখা ভূতে-ধরা ঘটনা

সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের বয়স তখন প্রায় ৪০। তিনি তখন কলকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে একটা বাড়িতে থাকেন। বাড়িটা দুতলা। উপরে অসমঞ্জবাবুরা থাকতেন, আর নীচে শঙ্করীবাবু নামে এক ভদ্রলোক সপরিবারে থাকতেন। শঙ্করীবাবুর সংসারে তিনি ছাড়া তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ। পুত্রটির বয়স ২৬।২৭, আর পুত্র-বধূটির বয়স ১৬।১৭।

একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে শঙ্করীবাবুর পুত্রবধূটি হঠাৎ তাদের দালানে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে। সকলে ছুটে গেল এবং তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষে, আধঘণ্টা পরে আপনা হতেই তার জ্ঞান ফিরে এল।

বউটির ওই যে সেদিন ফিট্ হ'ল, তারপর থেকে প্রতিদিনই ফিট্ হতে লাগল। আর আশ্চর্য এই যে, ঠিক ঘড়ি ধরে একেবারে বিকাল পৌনে পাঁচটার সময় ফিট্ হ'ত। ওই সময় সে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন গোঁ গোঁ করে অজ্ঞান হবেই।

বউটির এই ব্যায়াম সারাবার জন্য তার শ্বশুর ডাক্তার, কবিরাজ দেখালেন, কিন্তু কিছুই হ'ল না।

ওই সময় কলকাতায় বউবাজারে হিদারাম ব্যানার্জী লেনে একজন নামকরা ভূতের ওঝা ছিলেন। শঙ্করীবাবু শেষে তাঁকেই দেখানোর ব্যবস্থা করলেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে একদিন অসমঞ্জবাবু শঙ্করীবাবুর পুত্রকে নিয়ে ওঝার বাড়িতে গেলেন।

ওঝা সেদিন বিকাল পাঁচটার কিছু পরে শঙ্করীবাবুর বাড়িতে এলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ওইদিন বউটির আর ফিট্ হ'ল না।

ওঝা এলে শঙ্করীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন— আচ্ছা, এটা হিষ্টিরিক ফিট্ না ভূতে-পাওয়া।

ওঝা বললেন— ভূত বলেই মনে হচ্ছে। আমি এখনি একটা পরীক্ষা করচি। দুয়ের কোন্টা তা বোঝা যাবে। গোটা কতক তুলসীপাতা আমায় এনে দিন।

তুলসীপাতা দেওয়া হলে ওঝা সেগুলিকে হাতে রগড়ে ছোটো একটা গুলির মতো করে বল্লেন— এইটে কোনোরকমে বউমাটির নাকের কাছে একবার ধরতে হবে, অথচ তিনি কিছু না সন্দেহ করতে পারেন।

পাশের বাড়িতে একটি ছোটো মেয়ে সেখানে ছিল। তার ওপর এই কাজের ভার দেওয়া হল। সে হাতের মুঠোয় ওটা লুকিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে যেখানে বউটি বসে চুল বাঁধছিল, সেইখানে গেল এবং বউদি, তোমার নাকে সিঁদুর লেগেচে ব'লে মুছে দেবার ছলে তার সেই হাতের মুঠোটা নাকের কাছে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বউটি অজ্ঞান হয়ে সেইখানেই লুটিয়ে পড়লো। এই দেখে ওঝা বললেন— ফিট নয়, ভূত।— তারপর একটি ছোটো গঙ্গা জলের ঘটি থেকে হাতে একটু জল নিয়ে মনে মনে কী মন্তর প'ড়ে বউটির উদ্দেশে ছিটিয়ে বললেন— এইবার জ্ঞান হোয়েচে। দেখা গেল ঠিকই তাই, বউটি পূর্বের মতো বসে চুল বাঁধচে।

ওঝা বললেন— সন্ধ্যা হয়ে গেল এবং ভূতই যে, ঠিক তা জানা গেল। এখন আপনারা আমায় কাজ করবার জন্য সব আয়োজন করে দিন। তিনি কয়েকটা জিনিসের কথা বলে দিলেন— হোমের জন্য সামান্য কিছু বালি, কাঠের টুকরো, অশ্বত্থ পাতা, গঙ্গা জল, একটা জবা ফুল, চা-খড়ি, সরষে, কয়েকটা সুপারি প্রভৃতি।

বউটি যাতে দালানের দিকে না আসে তার ব্যবস্থা করা হ'ল। শঙ্করীবাবুর স্ত্রী রান্না ঘরে থেকে তার সাহায্যে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

দালানের মধ্যে সব জিনিসগুলি রেখে, দুখানা কাঠের পিঁড়ি পেতে দেওয়া হ'ল। ওঝা একখানা পিঁড়িতে বসে বললেন— আমি মন্ত্র পাঠ করে ও হোম করে সামনের পিঁড়িটাতে একটা চাপড় মারলেই বউটি রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে এই পিঁড়িটার ওপর বসবে, সুতরাং উঠোনের দড়িতে যে দু'একখানা কাপড় শুকোচ্চে, তা তুলে ফেলুন, আসতে বাধা না পায়। তাই করা হ'ল। কাপড় তুলতে দেখা গেল, বউটি রুটির জন্যে আটা মাখছে, আর শাশুড়ির সঙ্গে কথা কইচে। খানিক পরেই ওঝা শূন্য পিঁড়িটায় যেমন জোরে একটা চাপড় মারলেন, অমনি বউটি সব ফেলে রেখে 'যাচ্চি যাচ্চি যাচ্চি যাচ্চি' বলতে বলতে উঠান দিয়ে ছুটে এসে সেই পিঁড়িখানার ওপর খপ করে বসে পড়লো এবং ডাইনে-বাঁয়ে দুলতে লাগলো। ওঝা একটা ধমক দিলেন— স্থির হয়ে বসে থাক্ ও রকম দুলছিস কেন?— বউটি স্থির হয়ে বসলো। বউটি অত্যন্ত ভদ্র স্বভাব এবং লজ্জাশীলা ছিল, কিন্তু এখন তার মাথায় ঘোমটা নেই, দুচোখ বোজা।

এরপর অনেক কিছু প্রশ্নোত্তর চললো।

ওঝা বললেন— তুই এই ভালোমানুষ নিরীহ বউটিকে কেন পেয়েছিস?

বউ তেড়ে-ফুড়ে উঠে জবাব দিলে— পাবো না! ও কেন চুল আঁচড়ে চিরুনির ছেঁড়া চুলগুলি আমার গায়ে ফেলে দিলে ভর-সন্ধ্যেবেলায়?

— ওঃ! বেটা আমার নবাব-পুত্তুর! এই হোল বউয়ের অপরাধ। যাক্ ; এখন ওকে ছেড়ে চলে যা।— কথা কচ্চিস না কেন?

— যাবো না।

— যাবি না। তবে মজাখানা একবার দ্যাখ!— বোলে এক টুকরো হলুদ প্রদীপের শিখায় পুড়িয়ে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে হোমের আগুনের ওপর নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই— "যাবো— যাবো— যাবো— যাবো"— বলে বউটি হাঁপাতে লাগলো।

— তোর কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে দেখচি। এইবার দ্যাখ্ তোর কি দশা হয়।— বোলে ওঝা একগাছা ঝাঁটা নিয়ে মন্ত্র বলতে বলতে মেঝের ওপর সজোরে মারতে লাগলেন। অমনি "গেছি— গেছি। পিঠ জ্বলে গেল। যাবো যাবো যাবো। এক্ষণি যাচ্চি", বোলে বউটি কাতর হয়ে হাঁপাতে লাগলো।

মোটের ওপর শেষ পর্যন্ত ভূতকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হতে হ'ল। ওঝা শেষে বললেন— এই ব্যাটা, আস্তে আস্তে যাবি, বউটির যেন আঘাত লাগে না, বুঝেচিস্।

সঙ্গে সঙ্গে বউটি সেইখানে লুটিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে গেল।

এরপর থেকে বউটির আর কখনও ওইরূপ হয়নি।

এই কাহিনীটির উপসংহারে অসমঞ্জবাবু লিখেছেন :

এই যে ব্যাপারটা আগাগোড়া আমার চোখের সামনে ঘটলো, এর বিপক্ষে আমার কিছু বলবার নেই। এর আগে এইরূপ ভূতে-পাওয়া রুগির এবং ওঝা দ্বারা এইরূপ ভূত ছাড়াবার কথা কিছু শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি। এবার চোখের সামনে দেখে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলুম না। নানাদিক দিয়ে এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করেছি, কিন্তু এ সব বিষয়ে আমার জ্ঞানের স্বল্পতার জন্যে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারি নি।

প্রেমঙ্কুর বর্ণিত ভৌতিক উপদ্রব

ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ সাহেব ছিলেন, সেকালের একজন বিখ্যাত সরোদ-বাদক। সার আশুতোষ চৌধুরীর পত্নী লেডী প্রতিমা চৌধুরী যে "সংগীত সংঘ" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই সংগীত সংঘের অধ্যক্ষ ছিলেন এই ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ।

সংগীত সংঘের অধ্যক্ষতা ছাড়াও খাঁ সাহেব আরও অনেককেই সরোদ শেখাতেন।

খাঁ সাহেবের পরিবারবর্গ তাঁর দেশের বাড়িতে থাকত। আর তিনি একা কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন।

খাঁ সাহেবের বাড়িতে তাঁর শিষ্য ও বন্ধুবর্গের ভিড় সর্বদাই লেগে থাকত। এই দলের মধ্যে সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীও একজন ছিলেন।

খাঁ সাহেব তখন কলকাতায় ছাতুবাবুর বাজারের কাছে মাণিকতলা স্ট্রিটে একটা ছোট বাড়ি সম্পূর্ণ ভাড়া নিয়ে একা থাকতেন।

একদিন রাত্রি তখন প্রায় ১১টা। ওস্তাদজি শিষ্যদের বাজনা শেখাচ্ছেন। এমন সময় তিনি স্নানের ঘরে জলের কল খোলার শব্দ শুনতে পেলেন। (তখন কলকাতায় অনেক জায়গাতেই সারা দিনরাত জল থাকত)।

ওস্তাদজি জল পড়ার শব্দ শুনে নিজে স্নানের ঘরে গিয়ে কল বন্ধ করে এলেন।

কল বন্ধ করে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কল থেকে জল পড়ার শব্দ সকলেই শুনতে পেলেন।

ওস্তাদজি একটু বিস্মিত হয়ে আবার নিজে গিয়ে কল বন্ধ করে এলেন। কিন্তু ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার জল পড়তে শুরু হ'ল।

সেরাত্রে এইভাবে কয়েকবার বন্ধ করেও জলপড়া বন্ধ করতে পারলেন না। সারারাত্রি জল পড়তে লাগল।

এই ঘটনায় সকলেই বেশ বিস্মিত হলেন। এর পরের দিন ঠিক ওই সময় জল পড়া বন্ধ হ'ল বটে, কিন্তু উৎপাত আরম্ভ হল।

সেদিন গান বাজনার আসর চলছে, এমন সময় দেখা গেল আসরের মধ্যে কে যেন অদৃশ্য হস্তে উপর থেকে আস্তাকুঁড়ের, ময়লা ছড়িয়ে দিল।

ঘর পরিষ্কার করে সকলে আবার গান বাজনায় বসলেন, কিন্তু সেই রকম ময়লা পড়তে শুরু হ'ল।

এই উৎপাত রোজই চলতে লাগল। ব্যাপারটা যে রীতিমতোই ভৌতিক, এ বিষয়ে আর কারই সন্দেহ রইল না।

খাঁ সাহেবের এক বন্ধু ছিলেন, তাঁর বাড়ি কাবুলে। তাঁকে সকলে সৈয়দ সাহেব বলত। তিনি কিছু কিছু ভূত তাড়ানোর মন্ত্রতন্ত্র জানতেন।

খাঁ সাহেব তাঁর বন্ধুকে বাড়িতে আনলেন। বন্ধু এসে অনেক কৌশল করলেন এবং মন্ত্রতন্ত্রও আওড়ালেন, কিন্তু ভূত আর তাড়াতে পারলেন না।

খাঁ সাহেব তখন একদিন স্থির করলেন, ভূতের কল্যাণার্থে তিনি বাড়িতে একদিন জাঁক করে জলসার ব্যবস্থা করবেন।

একদিন জাঁক করে জলসাও দেওয়া হ'ল। কিন্তু সেই জলসার দিনেও ভূত প্রতিদিনকার মতো সেদিনও আস্তাকুড়ের ময়লা এনে ছড়াতে লাগল।

খাঁ সাহেব পরেও অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভূত কিছুতেই তাড়াতে পারেন নি। অগত্যা তিনি নিজেই ওই বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

রামপদ ও বিভূতিভূষণের ভূতে বিশ্বাস

সাহিত্যিক রামপদ মুখোপাধ্যায় ভূত প্রেতে একজন বিশেষ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু বঙ্গবাসী কলেজের বিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে একটি সত্যকার ভৌতিক কাহিনী শুনে গভীর বিশ্বাসে সেই কাহিনীটিকে গল্পাকারে ১৩৫৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা "প্রবাসী" পত্রিকায় লিখেছিলেন।

প্রবাসী পত্রিকায় রামপদবাবুর ওই গল্পটি প্রকাশিত হ'লে, সেটি পড়ে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তখন রামপদবাবুকে এক পত্রে লিখেছিলেন— আপনি এ গল্প পেলেন কোথায়? এ গল্প আমি যে অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে শুনেছিলাম। তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের কাহিনী বলে আমাকে বলেছিলেন। কাহিনীটি সত্য বলেই আমিও বিশ্বাস করি।

রামপদবাবু বিভূতিবাবুর চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন— আমিও ওই কাহিনী বুদ্ধদেববাবুর কাছেই শুনেছি এবং কাহিনীটি সত্য বলেই আমিও বিশ্বাস করি। বুদ্ধদেববাবুর মতো সৎবন্ধু এবং পণ্ডিতব্যক্তির কথাকে অবিশ্বাস করার কোনো হেতু দেখি না। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে জগতে কত জিনিসই না রয়েছে! আমরা সে সব জানি না। স্যার অলিভার লজ, মাদাম ব্লাভাটস্কি প্রমুখ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা তো পরলোকতত্ত্ব নিয়ে গভীর আলোচনা ও গবেষণা করে এ সবের প্রমাণই দিয়ে গেছেন। তাই বন্ধুবর বুদ্ধদেববাবুর বর্ণিত ভৌতিক কাহিনীটি যে সত্য, সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এখন বুদ্ধদেববাবুর বর্ণিত তাঁর সেই ভৌতিক কাহিনীটি হ'ল :

আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় দিল্লিতে ভারত সরকারের অধীনে পদস্থ অফিসার ছিলেন। তিনি দিল্লিতেই থাকতেন। তবে কখনো কখনো কার্য উপলক্ষ্যে সিমলাতেও তাঁকে থাকতে হ'ত। কলকাতায় তাঁর দুটা বড় বাড়ি ছিল। একটা বাড়িতে তাঁর কয়েকজন নিকট আত্মীয় ভাড়া দিয়ে থাকতেন। আর অপর বাড়িটায় অন্য ভাড়াটে ছিল। ওই আত্মীয়দের মধ্যে একজন সমস্ত ভাড়া আদায় করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

আমার সেই আত্মীয়টি বিপত্নীক ছিলেন। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে নিজের কাছে রেখে দিল্লিতেই পড়াতেন। তবে তাঁকে মাঝে মাঝে দিল্লি সিমলা করতে হ'ত

বলে, পুত্রের পড়াশুনায় ব্যাঘাত হচ্ছে দেখে, তিনি পুত্রকে কলকাতায় তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে রেখে, কলকাতায় তার পড়াশুনার ব্যবস্থা করলেন। ছেলেটি কলকাতায় পিতৃবন্ধুর বাড়িতে থেকেই বি. এ. পাস করল এবং এম. এ.-তেও ভরতি হ'ল।

ওই সময় ছেলেটি একদিন সিমলা থেকে টেলিগ্রাম পেল, তার বাবা গুরুতর রূপে পীড়িত।

টেলিগ্রাম পেয়েই সে সিমলায় তার বাবার কাছে গেল। বাপও ছেলের জন্যই যেন শুধু অপেক্ষা করেছিলেন। ছেলে গিয়ে কাছে বসলে, তাঁর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আগেই বাক্-শক্তি লোপ পেয়ে যাওয়ায় কোনো কথা বলতে পারলেন না। সেই দিনই তাঁর মৃত্যু হ'ল।

ছেলেটি জানত, কলকাতায় তাঁদের দুটা বাড়ি আছে। বাদুড় বাগানের বাড়িটায় যেখানে তাদের আত্মীয়রা থাকত, সে বাড়িটা ছেলেটি চিনত। কলকাতায় এসে ওই বাড়িতে সে দুএকবার গিয়েও ছিল। কিন্তু অপর বাড়িটা কোথায় তা সে জানত না।

পিতার মৃত্যুর কয়েকদিন পরে, বাড়ির ভাড়া এখন থেকে তাকেই দিতে হবে, একথা বলতে গেলে, আত্মীয়রা একজোট হয়ে ছেলেটিকে বললে— এ বাড়ি তো তোমার বাবার একার নয়। এ বাড়িতে আমাদেরও অংশ আছে। অতএব আমরা ভাড়া দেব না। এ আমাদেরও বাড়ি।

যে আত্মীয়টি বাড়ি ভাড়া আদায় করত, সে এবার বললে— তোমাদের আর একটা যে বাড়ি ছিল, সেটাও আর নেই। তোমার বাবা মৃত্যুর আগেই সেটা বিক্রি করে গেছেন।

আত্মীয়দের এই দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রে ছেলেটি একেবারে পথে বসল। সে তার পিতার গচ্ছিত অর্থেই কোনোরূপ নিজের খরচ চালিয়ে যেতে লাগল। তবে সে, আত্মীয়দের এই ষড়যন্ত্র ভাঙবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলে কি হবে! দলিল পত্র তো তার হাতে কিছুই নেই। পিতার মৃত্যুর পর বাড়ির আলমারি, বাক্স, সিন্দুক সমস্তই সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে, কিন্তু একটা বাড়ির দলিলও সে খুঁজে পায় নি।

ছেলেটি প্রতিজ্ঞা নিয়েই থাকে। এইভাবে কিছুদিন কেটে যায়। এমন সময় একদিন ছেলেটির একটি বন্ধু তাকে নিয়ে কলকাতায় পরলোকবাদীদের এক চক্রে যায়। সেখানে গিয়ে সে দেখলো যে, পরলোকবাদীরা প্ল্যানচেটের সাহায্যে মৃতব্যক্তির সহিত ভাবের আদান প্রদান করেছেন। এই দেখে, তার খুব আগ্রহ হ'ল যে, সেও চক্রে বোসে তার পিতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং তাদের বাড়ির দলিলের কথাটা জেনে নেয়। তখন ছেলেটি তার মনের সমস্ত কথা চক্রের সদস্যদের বলল।

পরদিন চক্রের সকলে ছেলেটির পিতার কথা চিন্তা করে চক্রে বসল। ছেলেটিকে চক্রে বসাল। কিন্তু তার পিতার আত্মা এলেন না। এইভাবে ক'দিনেই তারা ওই একই

চিন্তা নিয়ে চক্রে বসল। কদিনের মধ্যে শেষ দিনেই শুধু ছেলেটির পিতার আত্মা দেখা দিল। সেও আবার এক অভিনব রূপে। সকলেই পরস্পর হাত স্পর্শ করে চোখবুজে চক্রাকারে ব'সে ছেলেটির পিতার কথাই চিন্তা করছে। এক সময় ছেলেটি হঠাৎ চোখ চাইতে দেখতে পেল— ঘরের মধ্যে তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে তার পিতার ছায়ামূর্তি। তারপর চক্রে বসেই ছেলেটি ছায়াচিত্রের মতো পরিষ্কার দেখতে লাগল— তার পিতার সেই ছায়ামূর্তি ঘর থেকে বেরিয়ে কলকাতার পথ ধরে চলতে লাগল। বাড়ির পর বাড়ি ফেলে, বহুপথ অতিক্রম করে, সেই ছায়ামূর্তি শেষে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে থামল। বাড়িটা দুতলা, পাট্‌কিল রঙের। বাড়ির সামনে লোহার গেট। একটা বড় পেয়ারা গাছ গেটের পাশেই প্রাচীরের উপরে ঝুলে পড়েছে। লোহার গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত লাল সুরকির সরু পথ। সেই পথের দুধারে গোলাপ আর রজনিগন্ধার সারি। এই বাড়ির সামনে এসেই ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল।

চক্রের শেষে ছেলেটি তার এই ছায়ামূর্তির দর্শনের কথা সঙ্গীদের বলল। সঙ্গীরা শুনে কেউ কেউ বললেন— ওই বাড়িটা তাহলে নিশ্চয়ই কোনও উকিল বা অ্যাটর্নির বাড়ি। ওই উকিল অথবা অ্যাটর্নিই তোমার পিতার বিষয় সম্পত্তির তদবির ও মামলা-মোকদ্দমা করেন। তাঁর কাছেই তোমার বাড়ির দলিল থাকা স্বাভাবিক। এখন কলকাতা ঘুরে সেই বাড়ির সন্ধান করো।

ছেলেটি বললে— আমারও তাই দৃঢ় বিশ্বাস। ওই বাড়ি আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

এরপর থেকে ছেলেটির শুরু হ'ল সেই বাড়ি খোঁজা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কত আশা নিয়েই না ছেলেটি কলকাতার পথে পথে ঘুরে সেই বাড়ি খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু সেই বাড়ির হদিস্‌ই আর করতে পারল না। এইভাবে প্রায় তিনটা বছর কেটে গেল। কিন্তু তবুও সে উদ্যমহারা হ'ল না। রোজই একরূপ সে সেই বাড়ির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। অবশেষে একদিন দক্ষিণ কলকাতার উপকণ্ঠে সে তার সেই ঈপ্সিত বাড়ির দেখা পেল।

ছেলেটি তখনই বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা করল। বাড়ির মালিক কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ার। তবুও ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ছেলেটি তার বাবার নাম বলল। ইঞ্জিনিয়ার ওই নামের কোনো লোককে কখনও চেনেন না, বললেন।

ছেলেটির কত দিনের কত আশা এমনি ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায়, সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল। একবার ভাবল— তবে কি এ বাড়িটা নয়?

পরক্ষণেই সে আবার মনে মনে বলল— না, এইত সেই বাড়ি। সেই লোহার গেট, সেই পেয়ারা গাছ, সেই সুরকির পথ আর পথের দুধারে ফুল গাছের সারি। এ বাড়ি সেই বাড়ি, তাতে আর কোনো সন্দেহই নেই। এ বাড়ির মালিক বাবাকে চেনেন না, তবে বাবার আত্মা এই বাড়ি দেখালেন কেন?

ছেলেটি ভাবতে ভাবতে হতাশ হয়ে ফিরে আসছে। পথে দুএকটা বাড়ি অতিক্রম করে চলে এসেছে। এমন সময় পথের ধারে একটা বাড়ির রকে বসে একটি লোক দাড়ি কামাচ্ছিলেন। তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন— কাকে খুঁজছেন?

— আজ্ঞে, ওই বাড়িটায় গিয়েছিলাম।— ব'লে ছেলেটি আঙ্গুল দিয়ে সেই বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

— ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে গিয়েছিলেন? তা ও বাড়িতে গেলেন কি করে মশায়? দুটো বাঘের মতো কুকুর রয়েছে। কেউ গেলে আর রক্ষে আছে।

— আমি যখন যাই, তখন কুকুর দুটো বাঁধা ছিল।

— তাই রক্ষে! এই সেদিনেই মশায় পাড়ার একটি ছেলে ওর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, কুকুরের কামড় খেয়ে এল। লোকটি বছর দুই ওই বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে এসেছে। তা ওর কুকুরের ভয়ে কেউ ওর বাড়ির ধারেও যায় না।

বছর দুই ভাড়াটে হয়ে এসেছে শুনেই, ছেলেটি বলল— দু বছর এসেছেন? তার আগে কে ছিলেন?

— ওটা একজন অ্যাটর্নির বাড়ি। সেই অ্যাটর্নি ওই তো এই রাস্তার মোড়েই নতুন বড়ো বাড়ি করে উঠে গেছেন। আগে তিনিই এই বাড়িতে থাকতেন। এখন ভাড়া দিয়েছেন।

অ্যাটর্নির নাম শুনেই ছেলেটি এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি লোকটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, রাস্তার মোড়ে অ্যাটর্নির বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

অ্যাটর্নির সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিল। ছেলেটি তার বাবার নাম বলতেই অ্যাটর্নির চিনতে পারলেন। তবে বললেন— ক'বছর হ'ল আমি আর কোর্টে বেরোই নি। বুড়ো হয়েছি, তাই এখন সম্পূর্ণ অবসর জীবন যাপন করছি। আমার কাছে যার যা কাগজ পত্র ছিল, বছর দুই আগে আমার জুনিয়ারকে সব দিয়েছি। তার নামে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি গিয়ে দেখ, তোমাদের দলিলপত্র যদি তার কাছে থাকে।

অ্যাটর্নির চিঠি নিয়ে ছেলেটি সেই জুনিয়ারের কাছে গেল। গেলে তিনি বললেন— আপনার বাবার কোনো দলিলপত্র আমার কাছে নেই।

ছেলেটি ফিরে এসে বৃদ্ধ অ্যাটর্নির সে কথা জানাল। তখন বৃদ্ধ অ্যাটর্নীর তাকে বললেন— তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যাও। যদি কোনো সন্ধান করতে পারি বা তোমার বিষয় উদ্ধারের কিছু উপায় করে দিতে পারি, তোমাকে জানাব।

ছেলেটি ঠিকানা দিয়ে চলে এল।

এইভাবে আরও কয়েক মাস কেটে গেল।

শেষে একদিন সেই বৃদ্ধ অ্যাটর্নীর ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। ছেলেটি গেলে অ্যাটর্নীর বললেন— তোমাদের বাড়ির দলিল পাওয়া গেছে।

ছেলেটি শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলল— অ্যাঁ, পেয়েছেন!

বৃদ্ধ অ্যাটর্নীর তখন বলতে লাগলেন— আমার কিছু কাগজপত্র একটা লোহার সিন্দুকে থাকে। আমার পুরাতন বাড়ি থেকে এই বাড়িতে আসবার আগে ওই সিন্দুকটা একবার রং করাই। রংকরার দু-একদিন পরে সিন্দুকের তাকগুলর উপর মোটা করে খবরের কাগজ পেতে আবার দলিলপত্রগুলি তুলে রাখি। ওই সব তুলে রাখবার সময় তোমাদের বাড়ির দলিল দুটো, যেগুলো তোমার বাবা তোমার নামে উইল করে দেবার জন্য আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন,— সেগুলি কীভাবে ভুল করে আগেই তাকের উপর রেখে তার উপর খবরের কাগজ মোটা করে পেতে ছিলাম। সেদুটো যে তলায় পড়ে রইল, আর মনেই হল না। তখন রংটাও ভালো শুকায়নি, তাই দলিল দুটো রংয়ে আটকে গিয়েছিল। তুমি সেবার আসার পর সব নামিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু ওই খবরের কাগজ চাপা থাকায় ওদুটো আর নজরেই পড়ে নি। এখন আবার সিন্দুকটাকে রং করাতে গিয়ে সে কাগজ পত্র নামিয়ে তাকের উপর পাতা খবরের কাগজগুলি তুলবার সময় দেখি, নীচের তাকে তোমাদের দলিল দুটো রংয়ে আটকে রয়েছে। এই নাও তোমার দলিল। এই তোমার প্রমাণ। এখন তোমায় বাড়ি থেকে হটায় কে?

ছেলেটি দলিল হাতে নিল। নিয়ে গভীর বিস্ময়ে ভাবতে লাগল, সেই তিন বছর আগেকার চক্রে বসার কথা, যেদিন তার মৃত পিতা ছায়ামূর্তির রূপ ধরে এই অ্যাটর্নীর বাড়িখানা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রেততত্ত্ববিদ বিভূতিভূষণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ ছিলেন। তাঁর পরলোকতত্ত্বচর্চা ও ভৌতিক অভিজ্ঞতার দু-একটি কাহিনী বলছি :

বিভূতিবাবু যখন স্কুলে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র, সেই সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়।

বিভূতিবাবু বি. এ. পড়ার সময় প্রথম বিবাহ করেন, কিন্তু মাত্র দুবছর পরেই তাঁর এই প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

স্ত্রীবিয়োগের এক বছর পরে বিভূতিবাবুর মা মারা যান। ঠিক ওই সময় বিভূতিবাবুর একটি ছোট বোনও মারা যায়।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এতগুলি নিকট জনের মৃত্যু হওয়ায়, বিভূতিবাবু একের পর এক আঘাত পেয়ে অবশেষে সান্ত্বনা লাভের আশায় পরলোকতত্ত্বচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং এই নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েও ছিলেন। এজন্য তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্ববিদদের লেখা বহু গ্রন্থাদি কিনেও অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর সেই সব সংগৃহীত বই আজও তাঁর বাড়িতে রয়েছে।

সজনীকান্ত দাসের "শনিবারের চিঠি"র অফিস যখন কলকাতায় মোহনবাগান রোডে ছিল, সেই সময় বিভূতিবাবু ওই বাড়িতে বন্ধু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত কিছুদিন নিয়মিত চক্রে বসতেন। এছাড়া অন্যত্রও তিনি মৃত ব্যক্তির সহিত ভাবের আদান প্রদানের জন্য বহুবার চক্রে বসেছেন। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর মশায়ও একজন প্রেততত্ত্ববিদ ছিলেন। বিভূতিবাবু তাঁর সহিত প্রেততত্ত্ব নিয়ে রীতিমতো আলোচনা করতেন এবং চক্রেও বসতেন।

বিভূতিবাবু তাঁর "দেবযান" উপন্যাসখানি তাঁর এই শ্বশুর মশায়কে উৎসর্গ করে যান। তাঁর "দেবযান" উপন্যাসটি মৃত ব্যক্তিদের আত্মার কাহিনী নিয়েই লেখা।

বিভূতিবাবুকে তাঁর বন্ধুরা পরলোকবাদী জেনে এবং অনেকে তাঁর "দেবযান" উপন্যাস পড়ে, অনেক সময়ই কেউ কেউ তাঁর কাছে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে মতামত জানতে চাইতেন। এ সম্পর্কে দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের শাশুড়ি ঠাকুরানী মারা গেলে তাঁর স্ত্রী শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। তখন অচিন্ত্যবাবু বিভূতিবাবুকে একটি পত্র লিখে

পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানতে চেয়েছিলেন। বিভূতিবাবু উত্তরে অচিন্ত্যবাবুকে পরলোক সম্বন্ধে লিখে জানিয়েছিলেন। বিভূতিবাবুর লেখা সেই পত্রটি আজও অচিন্ত্যবাবুর বাড়িতে রয়েছে। পরে অবশ্য অচিন্ত্যবাবুও সস্ত্রীক চক্রে বসে পরলোক সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

আর একটি উদাহরণ :
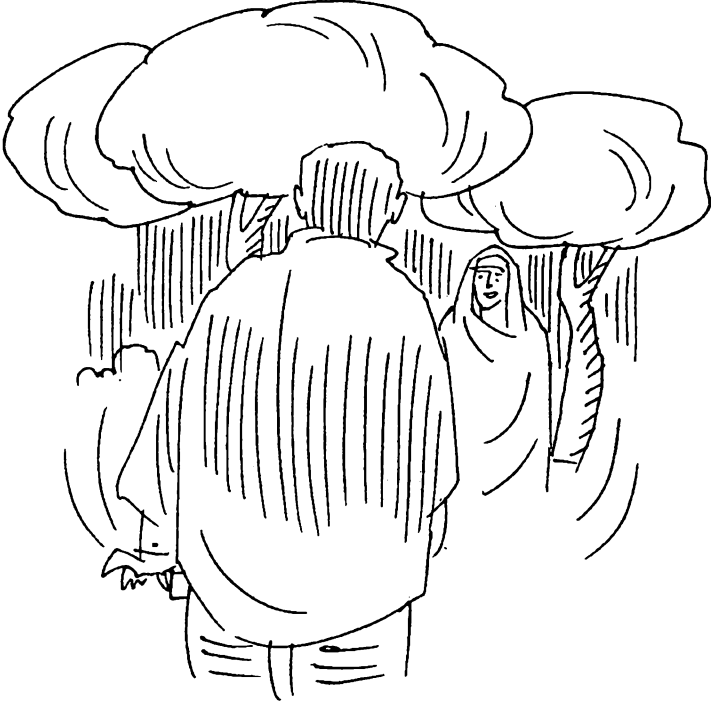
ঘাটশিলায় বিভূতিবাবুদের একটি বাড়ি আছে। তিনি প্রতি বৎসরই গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটিতে ঘাটশিলায় যেতেন। সেবারও পূজার ছুটিতে তিনি ঘাটশিলায় গেছেন। সেই সময় কলকাতার এক সহকারী অফিসার সস্ত্রীক ঘাটশিলায় বেড়াতে যান। অফিসারটির স্ত্রী ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা ও আধুনিকা। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ভদ্রমহিলা বিভূতিবাবুর "দেবযান" উপন্যাসটি পড়েছিলেন। বিভূতিবাবু ঘাটশিলায় তাঁদের বাসার নিকটেই থাকতেন শুনে, ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে দিয়ে একদিন বিভূতিবাবুকে নিমন্ত্রণ করে পাঠান।

বিভূতিবাবু গেলে ভদ্রমহিলা বললেন— দেখুন, আপনার দেবযান বইটা আমি পড়েছি এবং তাই থেকে প্রেততত্ত্বে আপনার পড়াশুনা ও অভিজ্ঞতা আছে জেনে, আমি আজ ক'টা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যই আপনাকে আনিয়েছি। এই বলে তিনি বললেন— আমার জীবনে দুটি ভৌতিক অভিজ্ঞতা আছে। সে দুটি এই?—

কয়েকদিন আগে এই ঘাটশিলাতেই একদিন দুপুরে বাড়িতে আমি একা ছিলাম। আমার স্বামী কাজে বেরিয়ে গেছিলেন। ওই সময় তিনজন ভদ্রমহিলা কোথা থেকে এসে বাইরে দরজায় কড়া নাড়তে থাকেন। দরজা খুলে সামনে গেলে, তাঁরা আমার স্বামীর নাম করে বললেন— এইটা কি অমুকের বাড়ি?

আমি হ্যাঁ বললে, তাঁরা বললেন— তবে ঠিকই এসেছি। চল, ভিতরে গিয়ে বসি, তোমার সঙ্গে ক'টা কথা আছে।

আমি তাঁদের বাড়ির ভিতরে এনে দোরে মাদুর পেতে বসালে, তাঁরা বসে আমার সংসার সম্বন্ধে এটা ওটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমিও উত্তর দিয়ে যেতে থাকলাম। এমন সময় তাঁদের একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি তোমার পিসিকে দেখেছ কি?

আমি বললাম— না, আমি জন্মাবার আগেই তিনি মারা যান।

এবার আর একজন বললেন— তুমি তোমার ছোট মাসিকে দেখেছিলে?

বললাম না, তিনিও আমার জন্মের আগেই মারা যান।

শেষে অপরজন বললেন— তোমার বড় মামীকে মনে পড়ে।

বললাম— না, আমার বয়স যখন খুবই কম, সেই সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে কখন দেখে থাকলেও কিছুই মনে নেই।

এবার ওই ভদ্র মহিলাদের মধ্যে যিনি একটু বর্ষীয়সী তিনি বললেন— দেখ, আমরাই তোমার সেই পিসি, মাসি ও মামী। আমরা মানুষ নই। আমরা অনেক আগেই মরে গেছি। আজ আমরা দেখা দিতে এসেছিলাম। এই বলে তাঁরা তিনজনেই দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনেই অন্তর্হিতা হয়ে গেলেন। আমি ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঠ হয়ে সেইখানেই বসে রইলাম।

এরপর ভদ্রমহিলা বিভূতিবাবুকে বললেন— এবার অপর অভিজ্ঞতার কাহিনীটি আপনাকে বলছি। সেটি এই :

কয়েক বছর আগে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে একবার হাজারীবাগে যাই। সেখানে যে বাংলোয় আমরা থাকতাম, সেই বাংলোর সামনেই ৪/৫ বছরের একটি ছোট্ট সুন্দর ফুট্‌ফুটে ছেলেকে খেলা করতে প্রায়ই দেখতাম। আমার ছেলে পুলে নেই। তাই আমার বড় ইচ্ছা হ'ত, ছেলেটিকে কাছে এনে একটু আদর করি। এই ভেবে যখনই আদর করবার জন্য ছেলেটিকে ধরতে যেতাম, অমনি ছেলেটি কোথায় অদৃশ্য

হয়ে যেত। আমার স্বামীকে ব্যাপারটা বললে, শেষে তিনি প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ নিয়ে বললেন— অনেক দিন আগে এই বাংলোয় এক সাহেব দম্পতি ছিলেন। তাঁদের একটি ৪/৫ বছরের ছেলেকে বাঘে নিয়ে যায়। তুমি যে ছেলেটিকে খেলা করতে দেখ, ওই ছেলেটিই সেই সাহেব দম্পতির মৃত পুত্র। এখানকার অনেকেই তাকে এই ভাবে খেলা করতে দেখেছে।

ভদ্রমহিলা বিভূতিবাবুকে তাঁর জীবনের এই ভৌতিক অভিজ্ঞতার কাহিনী দুটি বলে বললেন— এ কী করে সম্ভব? কী করে এমন হয়?

উত্তরে বিভূতিবাবু বলেছিলেন— এ সবই সম্ভব। এরমধ্যে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

এরপর বিভূতিবাবু ভদ্রমহিলাকে সেদিন প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছিলেন।

পরলোকবাদী বিভূতিবাবুর নিজের জীবনেও কয়েকটি ভৌতিক ঘটনা ঘটেছিল। এখানে তার একটা কাহিনী বলছি :

বিভূতিবাবুর পৈতৃক বাড়ি ছিল যশোহর জেলায় বারাকপুর গ্রামে। দেশবিভাগের পরে এই বারাকপুর পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্ত হয়েছে। এই বারাকপুর গ্রামটি এখন ২৪ পরগনা জেলায় বনগ্রাম থানার অধীন।

বিভূতিবাবুদের ওই বারাকপুর গ্রামে জামির নামে একজন মুসলমান ছিল। সে করাতির কাজ করত বলে, লোকে তাকে জামির করাতি বলে ডাকত। জামিরের ছেলে ছিল বিভূতিবাবুর সমবয়সী। ছেলেবেলায় বিভূতিবাবু প্রতিবেশী জামিরের ছেলের সঙ্গে খেলাধূলা করতেন এবং তার সঙ্গে তাদের বাড়িতেও যেতেন।

জামিরের ছেলেটি ছোট বেলাতেই মারা যায়। সেই থেকে জামিরের স্ত্রী বিভূতিবাবুকে নিজের ছেলের মতো ভাবত। জামিরের স্ত্রী গাছে আম পাকলে, কি কলা পাকলে, কি মুরগিতে ডিম পাড়লে আগে বিভূতিবাবুকে দিয়ে আসত।

ক্রমে বিভূতিবাবু বড় হলে কলকাতায় চলে গেলেন। লেখাপড়া শেষ করে কর্ম জীবনেও প্রবেশ করলেন। ওদিকে জামির করাতিও ততদিনে একমাত্র বৃদ্ধা স্ত্রীকে রেখে মারা যায়।

বিভূতিবাবু বড় হয়ে কলকাতা থেকে যখন বাড়িতে যেতেন, তখনও ওই জামিরের বৃদ্ধা স্ত্রী লাঠিতে ভর করে বিভূতিবাবুকে দেখতে যেত এবং বাবা আমার এসেছে, কেমন আছ, ইত্যাদি ব'লে খোঁজ খবর নিত। কোনো কোনো দিন গাছের ফলমূল, গোরুর দুধ ইত্যাদিও নিয়ে যেত।

বুড়ি ওই সময় বিভূতিবাবুকে বলত— বাবা আমার ছেলে নেই, তুমিই, আমার ছেলে। আমি মরলে আমার কাফিনে তুমি কাপড় দিও, কবরে মাটি দিও।

বিভূতিবাবুর আগের মতোই বুড়ির উপর শ্রদ্ধা ছিল।

এইভাবেই চলে আসছিল। বিভূতিবাবু তখন কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিটে একটা মেসে থাকতেন এবং কলকাতার একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সেবার শনিবারে কীসের একটা ছুটি পড়ায় বিভূতিবাবু শুক্রবারে বিকালে স্কুল থেকে এসেই বাড়ি রওনা হলেন। বাড়ি যাওয়ার জন্য তাঁর মনটাও সেদিন বড় টানছিল।

বিভূতিবাবু বিকালে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে দেশের স্টেশনে গিয়ে যখন নামলেন, তখন বেশ কিছুটা রাত হয়ে গেছে।

স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে বিভূতিবাবুদের গ্রাম। এই পথটা পায়ে হেঁটেই যেতে হয়। পথে বিভূতিবাবুর কোনও সঙ্গী ছিল না। তিনি একাই চলেছিলেন। দাড়িঘাটার পুল পার হয়ে, বিভূতিবাবু গ্রামে ঢুকবেন কি, ঠিক সেই সময় জ্যোৎস্নায় তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন, পুলের এক পাশে জামির করাতির স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে।

বিভূতিবাবু ভাবলেন— বুড়ি হয়ত তার গোরু, ছাগল কিছু খুঁজতে এসেছে। তাই তিনি আর তাকে কিছু না বলে বাড়ি চলে গেলেন।

বাড়ি গিয়ে বিভূতিবাবু শুনলেন— ওইদিনই দুপুরে জামিরের স্ত্রী মারা গেছে এবং দাড়িঘাটার পুলের পাশেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছে।[১]

১. এই প্রবন্ধের কাহিনীগুলি বিভূতিবাবুর স্ত্রী শ্রীমতি রমা দেবী, রমা দেবীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট আমি শুনেছি।

পরলোকতত্ত্ব চর্চায় অচিন্ত্যকুমার

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের শাশুড়ি ঠাকুরানীর মৃত্যু হ'লে তাঁর স্ত্রী নীহারকণা দেবী মাতার শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন।

অচিন্ত্যবাবু সেই সময় স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কিছুদিন পরলোকতত্ত্ব চর্চা করেছিলেন এবং মৃতা শাশুড়ি ঠাকুরানির আত্মার সহিত কথাবার্তা বলবার জন্য কিছুদিন সস্ত্রীক চক্রেও বসেছিলেন।

ওইসময় অচিন্ত্যবাবুর শাশুড়ি ঠাকুরানির আত্মা তাঁদের চক্রে আসতেন। এসে সেই আত্মা অচিন্ত্যবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে অনেক উপদেশ দিয়েও যেতেন।

অচিন্ত্যবাবু একদিন আমাকে বললেন— শাশুড়ি ঠাকুরানির আত্মা যেদিন প্রথম আমাদের চক্রে আসেন, সেদিন মিডিয়ামরূপী আমার হাত দিয়ে তিনি লিখিয়েছিলেন, তোমরা বাড়িতে ঠাকুর না বসালে আমি আর আসব না।

অচিন্ত্যবাবু ওই সময় আসানসোলে সবেমাত্র সাবজজ হিসাবে বদলি হয়ে যান। তাঁর বাড়িতে একটি ট্রাঙ্কের মধ্যে কতকগুলি ঠাকুর দেবতার পট ছিল, সেগুলি তখনও বসানো হয়নি। ট্রাঙ্কের মধ্যেই পড়ে ছিল।

অচিন্ত্যবাবু বললেন— ওই দেবদেবীর পটগুলি পরে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। একদিন চক্রে বসবার সময় দেখা গেল, যে টেবিলের উপর আমরা হাত রেখে চক্রে বসতাম, সেই টেবিলটা আশ্চর্যভাবে আস্তে আস্তে পাশের ঘরে অর্থাৎ শোবার ঘরে চলে গেল, এবং যেখানে দেবদেবীর পটগুলি ছিল, সেইখানে গিয়ে মাথা কুঁড়তে লাগল।

অচিন্ত্যবাবু আরও বললেন, তিনি একদিন তাঁদের চক্রে বসবার ঘরটিতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবিওয়ালা একটি ক্যালেন্ডার এনে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। একরাত্রে চক্রে বসলে, তাঁদের চক্রের সেই টেবিলটা আবার আস্তে আস্তে সরে গিয়ে সেই রামকৃষ্ণ দেবের ছবিটির নিকটে দেওয়ালের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল।

অচিন্ত্যবাবু বললেন, একদিন তিনি কোর্ট থেকে ফিরে সন্ধ্যার আগেই চক্রে বসেছিলেন। সেদিন তাঁর শাশুড়ি ঠাকুরানীর আত্মা এসেই তাঁদের বলেছিলেন— আজ আর আমাকে এখানে রাখবার জন্য তোমরা চেষ্টা করো না। একজন মহাপুরুষ এসেছেন, তাঁকে আমি দেখতে যাচ্ছি।

অচিন্ত্যবাবু বললেন, এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেলেন, মহাত্মা গান্ধি আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছেন। এ খবর তাঁরা তখনই রেডিয়ো মারফত শোনেন।

অচিন্ত্যবাবু বললেন— তাঁদের চক্রে অনেকেই এসেছিলেন। একদিন রবীন্দ্রনাথও এসেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আত্মাচক্রে এলে, অচিন্ত্যবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— আপনি কি আছেন?

এর উত্তরে মিডিয়মরূপী অচিন্ত্যবাবুর স্ত্রীর হাত দিয়ে লেখা হয়েছিল— আমি যে আছি, এও বলতে পারিনে ; আমি যে নেই, তাও বলতে পারিনে। এও এক রকমের থাকা।

অচিন্ত্যবাবু এরপর রবীন্দ্রনাথের আত্মাকে প্রশ্ন করলেন,— আপনি কি এখনও কবিতা লেখেন?

উত্তর এল— লিখি।

অচিন্ত্যবাবু বললেন— তবে এসেছেন যখন, তখন একটা কবিতা লিখুন।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মিডিয়মরূপী অচিন্ত্যবাবুর স্ত্রীর হাত দিয়ে লেখা হ'ল—

বেভুল বাতাসে কোন
বন্দনার গান ভেসে আসে,
তুমি কোথা, আমি কোথা
ভাবিতেছি বসে।

এই কবিতাটি দেখে অচিন্ত্যবাবু বললেন— এই কি রবীন্দ্রনাথের কবিতা? 'আসে'র সঙ্গে 'বসে'র মিল?— অচিন্ত্যবাবু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্ত্রীর হাতে যে খাতাটি ছিল, হঠাৎ তার পাতা উলটে গেল এবং পরিষ্কার পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা হ'ল— কবির খেয়াল! মিল কবিতা চাই? আচ্ছা,— বলেই আবার পাতা উলটে গেল। নতুন পাতায় লেখা হ'ল—

তুমি কোথা, আমি কোথা।
ভাবিতেছি বসিয়া আকাশে।

অচিন্ত্যবাবু বললেন— ওই কবিতাগুলি যে রবীন্দ্রনাথের আত্মার রচিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেন না, আমার স্ত্রী জীবনে কখনও কবিতা লেখেন নি। তিনি কবিতা লিখতেও জানেন না।

অচিন্ত্যবাবুর কাছে এই কবিতাগুলি আজও রয়েছে।

অচিন্ত্যবাবু নিজে আমাকে তাঁর এই পরলোকতত্ত্ব চর্চার কথাগুলি বলেছিলেন। তাঁর জীবিতকালে আমি এই প্রবন্ধ লিখে প্রকাশও করেছিলাম। তাই তখন "অচিন্ত্যবাবুর কাছে এই কবিতাগুলি আজও আছে" লিখেছিলাম।

সেদিন অচিন্ত্যবাবু দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আমাকে বলেছিলেন— শুদ্ধ দেহ মনে, একাগ্রভাবে কেউ যদি কোনো মৃতব্যক্তির আত্মাকে স্মরণ করে, তাহলে সেই আত্মা তার উপর ভর ক'রে এই মর্ত্যে আসতে পারে এবং এসে অনেক অলৌকিক কাজও দেখিয়ে যেতে পারে। এ সম্পর্কে অচিন্ত্যবাবু উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন— বিখ্যাত গণিতজ্ঞ সোমেশ বসু বোর্ডভর্তি বড়োবড়ো গুণ মুহূর্ত মধ্যে কি করে কষে দিতেন? সোমেশ বসুর মৃতা স্ত্রীর আত্মা এসে তাঁর উপর ভর করে গুণফলের সংখ্যাগুলি একটা একটা করে বসিয়ে দিতে বলতেন। একথা সোমেশ বসু নিজে আমাকে বলেছেন।

১৩৭৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ (১৯৬৬-র ১২ই আগস্ট) তারিখের সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় সোমেশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে অচিন্ত্যবাবুর ওই কথা বাদে সোমেশবাবু ও তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে কয়েকটা কথা ছিল। সেই লেখাটার কিছু এখানে উদ্ধৃত করছি—

> 'অমৃতে' প্রকাশিত 'গণিতে অলৌকিক শক্তি' প্রসঙ্গে আমাদের ঘরের ছেলে সোমেশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে যা জানি তা নিম্নে প্রকাশ করলাম। (৫৪ বৎসর পূর্বেকার *দৈনন্দিন লিপি* থেকে উদ্ধৃত।)

'১৩১৯ বঙ্গাব্দ। তখন কলকাতায় আমার পাঠ্য জীবন। ১৮নং ছুতারপাড়া লেনে একটি মেসে থাকি। এইখানে একটি যুবকের সহিত পরিচয় হয়। তাঁহার নিজের মুখে শোনা কাহিনি বলিতেছি। লোকটির ভিতর কিছুটা রোমান্স আছে। কোনো এক বন্ধের ভিতর বড় বোনের শ্বশুরবাড়ি বেড়াইতে যান। সেখানে তাঁহার ভগিনীর প্রতিবেশী একটি বালিকাকে দেখিয়া তিনি অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হন। এই বালিকাটিকেই নাকি তিনি কিছুদিন পূর্বে স্বপ্নে দেখেন। এই বালাই নাকি তাঁহার জন্ম জন্মান্তরের স্ত্রী। বালিকাটির নাম সরযূ। নাম শুনিয়া যুবকটি অভিভূত হইয়া পড়েন। এই নামটিই নাকি তাঁহার মানসকল্পিত মানসীর নাম। তখনকার দিনে লাভ ম্যারেজের চলন হয় নাই। ঘটনাক্রমে বালিকাটি তাঁহার স্বশ্রেণির পালটি ঘরের। দিদির চেষ্টায় তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের অনতিকাল পরেই তাঁহার মানস প্রতিমা তাঁহাকে ছাড়িয়া সতীলোকে চলিয়া গেল।

যুবকটি মন দিয়া পড়াশুনা করিতেছিলেন। তখন আই. এ. পড়িতেন। এই ঘটনার পর পড়া ছাড়িয়া দিয়া ছন্নছাড়া জীবন যাপন করিতেছেন। এই যুবকটিই সোমেশচন্দ্র বসু। নিবাস ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে। জন্ম ইংরেজি ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে।

সোমেশচন্দ্র আশ্চর্য শ্রুতিধর পুরুষ এবং অসাধারণ মানসিক শক্তিসম্পন্ন অপূর্ব গণিতজ্ঞ। তিনি একবার যাহা শোনেন তাহাই মনে রাখিতে পারেন। এই সময় একদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরীক্ষার ফল বাহির হয়। তিনি সিনেট হল হইতে তাহা দেখিয়া মেসে আসিয়া অবিকল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বড়ো বড়ো গুণ অঙ্ক মনে মনে কষিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার ফল বলিয়া দেন। ১০০ শত অঙ্কের সংখ্যাকে ১০০ শত অঙ্কের সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যে মুখে মুখে গুণফল বলিয়া দিতে পারেন। আমরা বহু প্রকারে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ঠকাইতে পারি নাই। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার (আশুতোষের) সামনে বসিয়া বি. এ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিয়া দেবেন। যদি পাস করেন, তবে তাঁহাকে বি. এ. ডিগ্রি দিবেন কিনা? আশুবাবু এই প্রস্তাবে অসম্মত হন।'

কুমুদবন্ধু রায়
শরৎ ঘোষ স্ট্রিট
কলকাতা ১৪

বি. এ. পড়েন নি, অথচ বি. এ.-র প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখে দেবেন বললেন। তাহলে এর মধ্যেও কি অচিন্ত্যবাবুর বলা সোমেশবাবুর স্ত্রীর ওই গুণফল বলে দেওয়ার মতো রহস্য ছিল না কী?

পরলোকবাদী সজনীকান্ত

সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও একজন পরলোকবাদী এবং পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন।

সজনীবাবু বলেন— একবার তিনি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে একটি ভৌতিক গল্প রচনা করেন। সেটি কলকাতা হাইকোর্টের এক বিচারপতি মশায়ের (ইনি পরে প্রধান বিচারপতিও হয়েছিলেন) বিমাতার কাহিনী। কাহিনীটি এই :

বিচারপতি মশায়ের বিমাতা ছিলেন তাঁর পিতার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। তাঁর পিতা দ্বিতীয়া স্ত্রীর সহিত একবার একটি ফটো তোলান। ফটো তোলা হলে, ফটোগ্রাফার 'ওয়াস্' করে অবাক হয়ে দেখলেন— তিনি যাঁদের ফটো তুলেছিলেন, তাঁদের পিছনে অতিরিক্ত আর এক ভদ্রমহিলাও কখন কীভাবে ফটোর মধ্যে এসে গেছেন।

ফটোগ্রাফার উক্ত বিচারপতির পিতাকে ফটোটি দিতে গিয়ে ফটোর মধ্যে ওই অতিরিক্ত জনের কথাও বললেন।

বিচারপতির পিতা ফটো হাতে নিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন— তাঁদের সঙ্গে তাঁদের পিছনে, তাঁর মৃতা প্রথমা স্ত্রীর ফটোও উঠে গেছে।

এই দেখে তখন তাঁর মনে পড়ল, যখন তিনি এই ফটো তোলান, সেই সময় তিনি ভেবেছিলেন— প্রথমা স্ত্রীকে নিয়েও এইভাবে একটা ফটো তোলানো উচিত ছিল। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি।— অবশ্য একাগ্রভাবেই তিনি তখন ওই কথা ভেবেছিলেন।

তিনি ভাবলেন, এই কথা চিন্তা করার জন্যই কি এরূপ হ'ল? তাঁর আত্মা পুনরায় দেহ ধারণ করে ফটোয় ধরা দিলেন।

সজনীবাবুর বৈবাহিক কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি গোপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের নিকট একবার কথা প্রসঙ্গে এই গল্পটি শুনে উপরিউক্ত বিচারপতি গোপেনবাবুকে বলেছিলেন— সজনীবাবু আমাদের বাড়ির কাহিনীটি নিয়েই গল্পটি লিখেছেন।

সজনীবাবু তাঁর 'আত্ম-স্মৃতি' নামক আত্ম-জীবনীতে 'অলৌকিক' নাম দিয়ে তাঁর মৃত মেজদার একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এখানে সেই কাহিনীটি হুবহু উদ্ধৃত করেই এই ভৌতিক প্রসঙ্গ শেষ করছি। সজনীবাবু লিখেছেন :

"আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, আচারে-ব্যবহারে, ভ্রমণে-পর্যটনে, খাদ্যে-পানীয়ে কালাপাহাড় বলিয়া পরিচিত মহলে আমার অখ্যাতি আছে। তবুও আজ অস্বীকার করতে পারি না, অলৌকিক শ্রেণীর ঘটনার আমি সাক্ষী হইয়া আছি।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মালদহ ইংরেজবাজার শহরের কালীতলা পল্লিতে আমার মেজদাদা নিদারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আমরা পালা করিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলাম। সেদিন সকালে বাবা আমাকে ঘুম হইতে তুলিয়া মেজদার শয্যাপার্শ্বে বসাইয়া একতলা বাড়ির ছাদে চলিয়া গেলেন। নিদ্রাবিজড়িত চোখে পাখা করিতে করিতে ঠিক মাথার উপরে বাবার ভারি পায়ের শব্দ শুনিতেছিলাম। মেজদা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। হঠাৎ পায়ের শব্দ থামিয়া গেল। প্রতিবেশী বন্ধু যতীনকাকা প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া মেজদার সংবাদ লইতে আসিয়াছেন। বাবার দৃঢ়কণ্ঠ কানে আসিল— আজই শেষ হয়ে যাবে। আমি চকিত হইয়া উঠিলাম। ঘুম জড়ানো চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল।— সে কী? বলিতে বলিতে যতীনকাকা বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। বাবাও ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন। আমি আড়ালে থাকিয়া উৎকর্ণ হইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিলাম। বাবা যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য এই :— মা তাঁহার পালা শেষ করিয়া পাশের ঘরে একটু গড়াইয়া লইতে গিয়াছেন, বাবা একা পুত্রের শিয়রে বসিয়া রাত্রির শেষ প্রহর জাগিতেছেন। সহসা একটা অস্বাভাবিক লাল আলোতে সমস্ত ঘরটা উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত চমকিত হইয়া কারণ অনুসন্ধানের জন্য ইতস্তত চাহিলেন। কোথাও কিছু নাই। মুমূর্ষু মেজদা হঠাৎ শয্যায় উঠিয়া বসিয়া যেন অভ্যাগত কাহাকে সম্বর্ধনা করিয়া বলিলেন, এই যে আমি যাচ্ছি।— বলিয়া তিনি আবার বালিশে মাথা রাখিলেন। লাল আলো মিলাইয়া গেল। বাবা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। সর্বশেষে বাবা বলিলেন— দাদার (অর্থাৎ আমার জ্যাঠামহাশয়ের) মৃত্যু শয্যায় বসিয়া ঠিক এই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। দাদা সেদিন মৃতা পত্নীকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। আজ অজুর কাছে কে আসিয়াছিল জানি না।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত না হইতেই সবই শেষ হইল। আমাদের ক্ষুদ্র সুখী সংসারে সেই প্রথম মৃত্যু প্রবেশ করিল। মেজদার মৃত্যুতে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। বাবা খুবই বিচলিত হইলেন। মা কিন্তু ধীর স্থির ছিলেন। মৃত্যুর পর দিন দ্বিপ্রহরের ঠিক পূর্বে বাবা ও ভাইবোন সকলে আমরা মায়ের শয়ন ঘরে অর্থাৎ বড়ঘরের মেঝেতে চৌকিতে বসিয়া মেজদারই প্রসঙ্গ আলাপ করিতেছিলাম। মা দুধ গরম করিতে সামনেই রান্নাঘরে ঢুকিয়াছিলেন। হঠাৎ বাবা গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে মেজদার নাম ধরিয়া ডাকিতেই আমরা সকলেই বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া দেখিলাম, মেঝের ঠিক মাঝখানে রক্ষিত একখানি চেয়ারে একটা লাল আলোয়ান গায়ে জীর্ণশীর্ণ মেজদাদা আসিয়া বসিয়াছেন। বাবা চিৎকার করিয়া মাকে ডাকিলেন— ওগো, কে এসেছে, দেখে যাও।

মা গরম দুধের বাটি আঁচলে ধরিয়া প্রায় ছুটিতে ছুটিতে শোওয়ার ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আসিয়া মেজদাকে দেখিয়াই 'বাবা আমার' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দুধের বাটি ছিট্‌কাইয়া ঝন্ ঝন্ শব্দ করিতে করিতে মেঝেতে গড়াইতে লাগিল। আমার দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। পরক্ষণেই ফিরিয়া দেখি মেজদা অন্তর্ধান হইয়াছেন।

মৃত মেজদাকে আমরা সকলেই দেখিয়াছিলাম। বাবা মেজদার নাম ধরিয়া ডাকিতেই আমরা হিপ্‌নোটাইজড্ হইয়াছিলাম, ঘটনাটিকে কখনই সেইভাবে উড়াইয়া দিতে পারি না। পরে এই বিষয়ে বই পড়িয়াছি, বড় বড় নাম করা পথভ্রষ্ট বৈজ্ঞানিকদের আলোচনাও দেখিয়াছি এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে অনেক তথ্য জানিয়াছি। বিভূতিকে বাহিরে কখনই আমল দিই নাই, ঠাট্টা করিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাসকে উড়াইয়া দিয়াছি ; কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফল্গু ধারার মতো মৃত্যু পরপারের এই টুকরো রহস্যটি আমাকে বরাবরই প্রভাবিত করিয়াছে। সূতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে ই মানুষের আরম্ভ নয় এবং চিতায় দগ্ধ হইয়াও যে তাহার শেষ নয়, এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়মূল।"

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ভূতদেখা'

সুদীর্ঘকাল ধরে নানা সময়ের হিমালয় পরিব্রাজক, বহু গ্রন্থের প্রণেতা উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজন সাধু-সদৃশ মানুষ। তিনি আমার দীর্ঘ দিনের পরিচিত, আমাকে ভ্রাতৃবৎ স্নেহও করেন।

'শরৎচন্দ্র' সম্বন্ধে লেখবার সময় তাঁর কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। তিনি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের প্রথম সাহসী প্রকাশক তো বটেই, তা ছাড়া শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজনও ছিলেন।

এই উমাপ্রসাদবাবু তাঁর 'অ্যালবাম' গ্রন্থে 'ভূতদেখা' প্রবন্ধে 'প্রকৃতই রহস্যময় ও ভৌতিক কাণ্ডই' বলে একটি কাহিনী লিখেছেন। উমাপ্রসাদবাবু এই কাহিনীটি একদিন মুখেও আমাকে বলেছিলেন। কাহিনীটি তাঁর মুখের কথাতেই বলি—

আমার পিসেমশায়ের বাড়ি ছিল নৈহাটীতে। আমার বড় পিসতুতো দাদা অর্থাৎ শ্রীশ-দা চাকরি থেকে অবসর নিয়ে নৈহাটীর বাড়িতে বসে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করতেন।

একদিন নৈহাটীতে গঙ্গার ঘাটের পাশে একটা গলিত নারী শবদেহ আট্‌কে আছে দেখে, তিনি সেটা তুলে আনেন। এনে শবদেহের গলিত মাংস ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে কঙ্কালটা বার করেন। কাচের শো-কেস তৈরি করিয়ে বসবার ঘরে সেই কঙ্কালটা রেখে দিয়েছিলেন। আমি সে কঙ্কাল দেখেছি।

কয়েক বছর পরে শ্রীশ-দা কলকাতায় বালীগঞ্জে বাড়ি করে সপরিবারে সেখানে চলে আসেন। আসবার সময় সেই কঙ্কালটা খুলে একটা হাঁড়ির মধ্যে ভরে নিয়ে আসেন। এনে চিলেঘরের এক কোণে রেখে দেন।

এখানে আসার কিছুদিন পরে দেখা গেল, শ্রীশ-দার একটা ঘরের দেয়ালে কার একটা হাতের ছায়া পড়ছে। ছায়াটা যেন কি ধরতে চায়। এই সময় শ্রীশ-দার পোলিও রোগগ্রস্ত এক শিশু পুত্রের প্রবল জ্বর হয় এবং জ্বরে নানা রকমের ভুল বকতে থাকে। এটাকে কোনো ভৌতিক ব্যাপার ভেবেই হয়তো শ্রীশ-দা পুত্রের চিকিৎসার জন্য একজন ওজা আনেন। তিনি এসে মন্ত্র পড়ে রোগীর গায়ে জল, সরষে ইত্যাদি ছিটাতে থাকেন এবং তাকে প্রশ্ন করেন— তোর নাম কী? তোর বাড়ি কোথায়? এখন কোথায় আছিস্? ইত্যাদি। শ্রীশ-দার রোগগ্রস্ত পুত্রের

মুখ দিয়ে উত্তর এল— আমার নাম সুশীলা। অমুক গ্রামে (বলে একটা গ্রামের নাম বলল) আমার বাড়ি ছিল। এখন থাকি এই বাড়ির চিলে ঘরে একটা হাঁড়ির মধ্যে।

এই কথা শুনে শ্রীশ-দা এবং বাড়ির সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। শ্রীশ-দা তখনি ওই হাড়ের হাঁড়ি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রী-দার পুত্র ভূতে পাওয়া থেকে মুক্তি পেল এবং বাড়িতে সেই হাতের উপদ্রবও বন্ধ হয়ে গেল।

শ্রীশ-দা তাঁর ভূতে পাওয়া ছেলের মুখ থেকে সুশীলার গ্রাম বলে যে গ্রামের নাম শুনেছিলেন, সেই গ্রাম নৈহাটীর নিকটে হওয়ায়, পরে তিনি একদিন ওই গ্রামে যান। গিয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন— কয়েক বছর আগে সত্যিই ওই গ্রামের সুশীলা নামে একটি যুবতী গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছিল।

বঙ্কিম সংগ্রহশালায় বসে শোনা একটি কাহিনী

নৈহাটীর কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্য-সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবন, যেখানে বসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই ভবনকে বলেছেন 'বাঙালীর প্রধান তীর্থ'।

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই তীর্থে অর্থাৎ কয়েকটি ঘর ও ফুলবাগান সহ পৃথক এই সুন্দর ও মনোরম বাড়িতে 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা' স্থাপন করেছেন। আমি দীর্ঘ ৩৯ বছর ধরে আজও (১৯৯৪) এই প্রতিষ্ঠানের কিউরেটর বা অধ্যক্ষ হয়ে আছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বৈঠকখানা ভবনের পাশেই তাঁর বিশাল বাসভবন। বাস ভবনের এক ধারে দুর্গাদালান, দালানের সামনে প্রশস্ত চত্বর। চত্বরের এক পাশে 'বঙ্গদর্শন' প্রেসের ঘর, দপ্তরিখানা, দরোয়ানদের থাকার ঘর ইত্যাদি। এ সবের কিছু আজও আছে, কিছু অবলুপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাসভবন ইত্যাদির সংস্কার প্রভৃতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দে সরকারের পূর্ত বিভাগের হাতে ২৫ লক্ষ টাকা দেন। এ ব্যাপারে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী এবং উচ্চ শিক্ষা সচিব দিলীপ ভট্টাচার্য আই. এ. এস. খুবই উৎসাহী ও আগ্রহী।

সরকার টাকা দেওয়ায় এক বছরের মধ্যেই সরকারের পূর্তবিভাগ কাজ আরম্ভ করেন। সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের কাজ নিখুঁত ও সুন্দর করার জন্য পূর্তবিভাগের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সিনিয়ার আর্কিটেক্ট প্রভৃতি তদারকির জন্য প্রায়ই আসেন। ব্যারাকপুরের অ্যাসিট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তপন ভট্টাচার্য, ওয়ার্ক অ্যাসিট্যান্ট রঞ্জিত দাস এঁরা তো থাকেনই। বঙ্কিম সংগ্রহশালার কিউরেটর বলে এঁরা এসে বাড়ি ইত্যাদি নিয়ে আমার সঙ্গে সর্বদাই আলোচনা করেন।

সেদিন বিকালের দিকে অফিসে আমার হাতে কাজ না থাকায় বসে বসে প্রেসে ছাপতে দেওয়া আমার 'ভৌতিক কাহিনী' বইটির প্রুফ দেখছিলাম। এমন সময় পূর্তবিভাগের নর্থ ক্যালকাটা ডিভিসনের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিপুল চক্রবর্তী এবং ওই পূর্তবিভাগেরই সিনিয়ার আর্কিটেক্ট কল্যাণ দাশগুপ্ত, আমার ঘরে এসে হাজির। সামনে চেয়ারে বসে আমার হাতে প্রুফ দেখে কল্যাণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন— কিসের প্রুফ দেখছেন?

বললাম, 'ভৌতিক কাহিনী' নামে আমার একটা বই ছাপা হচ্ছে, তারই প্রুফ দেখছি।— এরপর ভৌতিক কাহিনী নিয়ে বিপুলবাবু ও কল্যাণবাবুর সঙ্গে কিছু আলোচনা হয়। শেষে কল্যাণবাবু বললেন— আমার জীবনে একটা এরূপ অভিজ্ঞতা
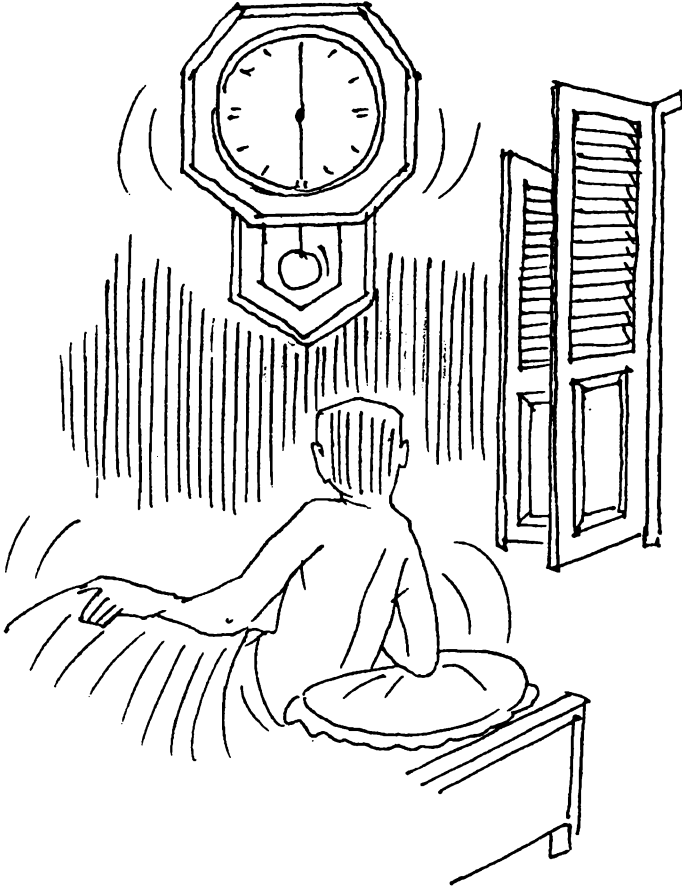
আছে। বলছি— আমার দুটি শিশু কন্যাকে রেখে আমার স্ত্রী মারা যায়। ছোটোটি তখন নিতান্তই শিশু, দুগ্ধ-পোষ্য। বাড়িতে লোকজন থাকলেও, স্ত্রীর মৃত্যুতে আমার দুই কন্যার একাধারে পিতার ও মাতার দুজনেরই কর্তব্য করতে হ'ত।

প্রতিদিনের মতো সে রাত্রেও এই কন্যাদের নিয়ে খাটে শুয়ে আছি। ছোটো কন্যাটি আমার কাছে, বড়োটি তার পাশে একটু দূরে।

খাটে শুয়ে শুয়েই দেখলাম, ভোরের আভা দেখা দিয়েছে। জেগেই আছি। বিছানার পাশের দিকে একটা জানালা বন্ধ ছিল। দেখলাম, বন্ধ জানালা খুলে গেল। জানালা খুলে যাওয়ায় দেখলাম, সেখানে আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে। সে-ই জানালাটা খোলে। তারপর দেখলাম, সে খোলা জানালা দিয়ে ঘরে এসে বিছানার পাশে আমার কাছে দাঁড়াল। তারপর একটু রাগত মুখেই যেন আমাকে বলল— মেয়েকে কখন খাওয়াবে? ছ'টা তো বাজে।

দেওয়াল ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি তখন ঠিক ছ'টা। ঘড়ির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দেখি— সে আর নেই, অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অধ্যাপক সনাতন গোস্বামীর বলা দুটি ভৌতিক কাহিনী

বৈষ্ণব পদাবলি পরিচয়, গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি ও শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি বহু গ্রন্থের লেখক ও সম্পাদক, কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক, পরম বৈষ্ণব সনাতন গোস্বামী আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত, এমন কি ছোট ভাই-এর মতোই। সনাতন একদিন কথায় কথায় তাঁর দুটি ভৌতিক অভিজ্ঞতার কাহিনী আমাকে বলেছিলেন। সেই কাহিনী দুটি এখানে তাঁর নিজের ভাষাতেই দিচ্ছি :

১. ১৯৬৮ সালের কথা। সেই সময় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার শুরুতে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিকে আমার সহকর্মী হিসাবে পেয়েছিলাম। তাঁর নাম ভৈরব ঘটক। ভৈরব বয়সে আমার থেকে কিছু ছোটো ছিল। কিন্তু বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যাপনার খ্যাতিতে সে ছিল সম্ভ্রমের পাত্র। অল্পদিনের মধ্যেই আমার সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্কে গড়ে ওঠে। বাগ্মী, মনস্বী ভৈরব অত্যন্ত উষ্ণ হৃদয়বৃত্তি সম্পন্ন ছিল। তার বড় গুণ ছিল সব বয়সের, সব মতের মানুষের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতে পারতো।

আমার এবং আমাদের সকলের সেই প্রিয় বন্ধু অধ্যাপক ভৈরব ঘটক আকস্মিকভাবে মারা গেল এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে। ওই ঘটনাটার আঘাতের বেদনা আজও আমার মনে লাগে।

একদিন দুপুর বেলায় কলেজ থেকে বেরিয়ে আমি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটে যাই। আমার গন্তব্যস্থল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আমি ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটের সামনের গেট দিয়ে কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে ঢুকেছি। হঠাৎ দেখি আমার সামনে কয়েক হাত দূরে ভৈরব চলেছে। ছোটখাট, গোলগোল, সুন্দর, সুপুরুষ। গায়ে হাঁটু ছাড়িয়ে যাওয়া ঢোলা খদ্দরের পাঞ্জাবী। হাতে কালো রঙের পেটমোটা পোর্টফলিও ব্যাগ।

কলেজ স্কোয়ার তখন সচল। লোকজনের যাতায়াত, সাঁতার, পার্কে বসা— সবই চলছে। আমিও ভুলে গেছি যে, ভৈরব নেই। ও যখন বেঁচে ছিল, তখন আমরা প্রায়ই একে অপরকে চমকে দেবার জন্য পিছন থেকে গিয়ে হঠাৎ ধরতাম। সেই ইচ্ছা নিয়ে আমি দ্রুত পায়ে এগোতে থাকলাম। কিন্তু যত দ্রুতই যাই— দেখি দুজনের দূরত্ব আর ঘোচে না। সহসা ভৈরব চলতে চলতে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে একবার

তাকালো। মুখে বিষণ্ণ মলিন মৃদু হাসি। তারপর আর তাকে দেখতে পেলাম না। সেই মুহূর্তে একটা তড়িৎ প্রবাহ যেন আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগলো। আমি হতচকিত, গতি শক্তিহীন হয়ে গেলাম। দিন দুপুর। আমি পথ চলছি। চারদিকে কর্মচাঞ্চল্যতা। এর মধ্যে স্বপ্ন দেখা বা কল্পনার অবকাশ কোথায়? সুতরাং আমি তো ভুল দেখিনি। অন্য লোককে যদি ভুল ভেবে থাকি, তাহলে সেই লোকটাই বা কোথায় গেল? আজও আমার এই অনুভূতি জাগায় যে, যে আমাকে দেখা দিয়েছিল? সে ভৈরব-ই। সে কী সেদিন আমাকে শেষ দেখা দিতে এসেছিল। এ প্রশ্নের উত্তর আমি আজও পাইনি। কোনো দিন পাব কিনা জানি না।

২. কর্মজীবনের শুরুতে আমি কলকাতার বাইরে বর্ধমান রাজ কলেজে অধ্যাপনা করি কয়েক বছর। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে এই কলেজটিও ঐতিহ্যমণ্ডিত। এর অধ্যাপক এবং ছাত্র সংখ্যাও যথেষ্ট। সুন্দর সেই পরিবেশে সকলে মিলে আমরা বেশ সুখেই ছিলাম।

এই কলেজে কালীবাবু নামে দুজন অধ্যাপক ছিলেন। একজনকে আমরা কালীদা, অপরজনকে কালীবাবু বলতাম। দ্বিতীয় কালী অর্থাৎ কালীবাবু তাতে বেশ ক্ষুব্ধ ছিলেন, কেন তাঁকেও দাদা বলা হয় না।

কালীবাবু অত্যন্ত রুগ্ন, অতি বাতিকগ্রস্ত ও খিট্‌খিটে মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর একটা বিশেষ গুণ ছিল, যেটা আমার খুব ভালো লাগতো, তিনি কখনও পরনিন্দা করতেন না। এছাড়া তিনি বৈঠকী গল্পে নিপুণ ছিলেন। সিরিয়াস মুডে তিনি অনেক অসম্ভব কথা, বিশ্বাসযোগ্য করে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বলতেন।

এইরূপ আকর্ষণীয় চরিত্রের কালীবাবুকে আমরা ভালোইবাসতাম। একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে কালীবাবু নার্সিংহোমে ভরতি হন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যান।

তখনকার দিনে কলেজ শিক্ষকদের বেতন ছিল অতি সামান্য। কালীবাবুর হঠাৎ মৃত্যুতে তাঁর সংসার অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়ে গেল।

কালীবাবুর মৃত্যুর পরদিন তাঁর এক বন্ধু দুর্গাপুর থেকে তাঁর বাড়িতে আসেন। এসে বলেন— কালী কোথায়? কালী যে কাল আমার সঙ্গে দেখা করে বলে এল, কিছু টাকার প্রয়োজন— তুমি কিছু টাকা নিয়ে কাল অতি অবশ্যই আমার বাড়িতে যাবে! তাই তো টাকা নিয়ে এসেছি।

কিন্তু তিনি যখন শুনলেন— কালীবাবু কালই নার্সিংহোমে মারা গেছেন, তখন তিনি শুনে অবাক হয়ে গেলেন। পরে শুধু বললেন— কালী যে অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে ছিল, এ কথাও তো আমি জানতাম না। আশ্চর্য ব্যাপার! মৃত্যুর পরেও দেখা দিয়ে তার অভাবের সংসারের জন্য টাকা চেয়ে এল!

সংযোজন

এই 'ভৌতিক ও অলৌকিক কাহিনী' বইটিতে অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকের 'আত্মজীবনী' থেকে বা অন্য কোনো লেখা থেকে কাহিনী নিয়ে দিয়েছি। আবার কয়েকজন সাহিত্যিকের মুখে শোনা কাহিনীও দিয়েছি। যেমন— এঁরা হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

অচিন্ত্যবাবু, রামপদবাবু প্রমুখর কাছে শোনা আমার বর্ণিত কাহিনীতে বই-এর কোনো পাঠকের যদি কিছু সন্দেহ হ'ত, তাহলে তিনি এঁদের জিজ্ঞাসা করে সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারতেন। কিন্তু আজ আর এঁরা ইহলোকে নেই, পরলোকে।

প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডা. অমলেন্দু সরকার দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের বাড়ির চিকিৎসক। শুধু চিকিৎসকই নন, আমার বিশেষ বন্ধু স্থানীয়ও। বন্ধু আরও এইজন্য যে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী অধ্যাপিকা সারা সরকার উভয়েই সাহিত্য-প্রেমী। সারা দেবী লেখিকাও। অমলেন্দুবাবুর দুজন কম্পাউন্ডার অরুণ দাস এবং সবিতা চন্দ। এঁরাও অমলেন্দুবাবুর মতোই সাহিত্যপ্রেমী। একদিন ডাক্তারখানায় গেলে— ডাক্তারবাবু তখন ছিলেন না— এখন আমি কি লিখছি, কম্পাউন্ডাররা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি আমার ছাপতে দেওয়া 'ভৌতিক কাহিনী' বইটির কথা বললে, সবিতা দেবী কথায় কথায় তাঁর ছেলেবেলায় নিজের জীবনের একটা ভূত দেখার গল্প বললেন।

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গৌতম দাশগুপ্ত একদিন তাঁদের বাড়ির একটা ভৌতিক ঘটনা আমাকে শোনান।

এমনি আমার পরিচিত জীবিত আরও কয়েকজনের বলা ভৌতিক কাহিনী আমার সংগ্রহে আছে। এ সবের মধ্য থেকে মাত্র ৩ জনের বলা ক'টা কাহিনী এখানে দিলাম।

এ কথা সত্য যে, আমাদের এই দেশে আজও এমন সব সাধুসন্ন্যাসী দেখা যায়, যাঁরা প্রচুর অলৌকিক শক্তির অধিকারী। এঁদের এই শক্তির পরিচয় পেয়ে শুধু আমরাই নয়, অবিশ্বাসী ইউরোপীয়ানরা পর্যন্তও মুগ্ধ হয়ে যান। এখানে এক ইউরোপীয় সাহেবের দেখা এক ভারতীয় সাধুর একটি অলৌকিক কাহিনী বলছি। সাহেবের নাম এইচ্, হেউড (H. Heyood)। তিনি এই কাহিনীটি একটি পত্রিকায় লিখেছিলেন। সাহেবের সেই ইংরাজী লেখার মর্মার্থ এইরূপ :—

সাহেব কাহিনী বলবার আগে ভূমিকা হিসাবে লিখেছেন—ভারতে অনেকই আশ্চর্য ঘটনা ঘটে থাকে। বিজ্ঞান সে সবের ব্যাখ্যা করতে পারে না। মানুষেও বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু তবুও সে সব ঠিকই ঘটে।

এরপর সাহেব কাহিনীটি এইভাবে বলেছেন :—

তিনমাস আগে আমি একদিন কোইম্বাটোর (Coimbator) থেকে ত্রিচিনোপলি (Trichinopoly) যাচ্ছিলাম। আমি একটা বিভক্ত (Composite) রেলগাড়ির কামরায় বসেছিলাম। ঐ কামরাটির অর্ধেক প্রথম শ্রেণী, বাকিটা দ্বিতীয় শ্রেণী। আমি একাই প্রথম শ্রেণীতে ছিলাম। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে মাত্রা একজন কৌপিনধারী ভারতীয় সাধু বসেছিলেন। আমাদের ট্রেণ প্রথম একটা বড় জংসনে এলে, একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান টিকিট চেকার টিকিট চেক করতে আমাদের ঐ বিভক্ত কামরাটিতে উঠলেন।

টিকিট চেকার সাধুর কাছে গিয়ে টিকিট দেখতে চাইলে, সাধু টিকিট দেখাতে পারলেন না। তখন চেকার সাধুকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে প্ল্যাটফরমের বাইরে করে দিয়ে এলেন।

এদিকে অল্পক্ষণ পরেই ট্রেণ ছাড়বার সময় হয়ে এল। ঘণ্টা পড়ে গেল। গার্ড সাহেবও হুইসেল দিলেন। কিন্তু ট্রেণ আর চলে না। ইঞ্জিনচালক কত চেষ্টা করতে লাগলেন, তবুও ট্রেণকে এতটুকুও নড়াতে পারলেন না। তখন রেল কর্মচারীরা ছুটাছুটি ফেলে দিলেন। বেশ একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। ইঞ্জিন খারাপ হয়েছে ভেবে, সেটা বদলে নতুন ইঞ্জিন লাগাবার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু ঐ ইঞ্জিনকেই একচুলও সরাতে পারল না।

ঐ সময় দেখা গেল, সাধু রেলওয়ের বেড়ার বাইরে ইঞ্জিনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

টিকিট চেকার যখন সাধুকে গাড়ী থেকে টেনে নামিয়ে প্ল্যাটফরমের বাইরে করে দেন, তখন কয়েকজন ভারতীয় রেলযাত্রী ঐ ঘটনাটি দেখে ছিলেন। তাঁরা এখন প্রচার করতে লাগলেন— ওই সাধুই ট্রেণ আটকে রেখেছেন।

এই কথা ক্রমে সাহেব ইঞ্জিনচালক, সাহেব গার্ড ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান চেকারের কানে গেল। তাঁরা ত শুনেই উপহাস করতে লাগলেন।

ইঞ্জিনচালক বার বার ইঞ্জিনের প্রত্যেকটা অংশ বিশেষভাবে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, সবই ঠিক আছে। কিন্তু তবুও ইঞ্জিন আর চালাতে পারলেন না।

অবশেষে সেখানকার হিন্দু স্টেশন মাস্টার সাধুর সঙ্গে কথা বলতে সংকল্প করলেন। স্টেশন মাস্টার সাধুর সঙ্গে কথা বললে, সাধু মুখে কোনও কথার উত্তর দিলেন না। তবে ভাব-ভঙ্গীতে জানালেন যে, তাঁকে যদি তাঁর গন্তব্য স্থল পর্যন্ত বিনা ভাড়ার ট্রেণে চড়ে যেতে দেওয়া হয় এবং তাঁকে আর বিরক্ত করা না হয়, তাহলে তিনি ইঞ্জিন মুক্ত করে দেবেন।

সাধুর এই প্রস্তাবে স্টেশন মাস্টার এবং রেলওয়ে কর্মচারীরা সম্মত হলেন।

তখন সাধু ধীরে ধীরে তাঁর সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাটিতে এসে বসলেন। তারপর সামনে ঝুঁকে স্টেশন মাস্টার ও গার্ড সাহেবকে (এঁরা সাধুকে গাড়িতে পৌঁছে দিতে সঙ্গে এসেছিলেন) ট্রেণ ছেড়ে দেবার জন্য সংকেত করলেন।

গার্ড সিটি দিলেন ও নিশান নাড়লেন। ওদিকে সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিন থেকে বাঁশির শব্দ হল এবং গাড়িও চলতে সুরু করল।

এই বিজ্ঞানের যুগে সাধুর এমন একটা অলৌকিক কাজ দেখে আমি মহাবিস্মিত হয়ে গেলাম। অতবড় একটা শক্তিশালী যন্ত্রদানবকে সাধু কিসের বলে আটকে রেখেছিলেন, তা কল্পনাই করতে পারলাম না।

এখানে সাহেবের বর্ণিত এই কাহিনীটির ন্যায় তারাপীঠের মহাসাধক বামাক্ষ্যাপার সম্বন্ধেও ঠিক এই ধরণেরই একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

সাধুরা কিভাবে এই যে অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে থাকেন, তা সাধারণ মানুষের বুদ্ধি অগম্য। তবে কেউ কেউ বলেন যে, ইচ্ছাশক্তি বা উইল ফোর্স-এর জোরেই এঁরা এই সব করে থাকেন এবং এসব নাকি যোগসাধনা ও অভ্যাসের দ্বারা পারা যায়। এঁরা আরও বলেন— লোকে যে সম্মোহিত বা মেস্‌মারাইজ্‌ড করে, সেও ঐ ইচ্ছাশক্তির বলেই।

এই উইল ফোর্স ও মেস্‌মারাইজের কথা বাদ দিলেও ভারতীয় সাধুদের অনেকের সম্বন্ধে আবার শুনা যায় যে, তাঁরা একস্থানে বসে কিভাবে দূরের বস্তু দেখে বলে দিতে পারেন এবং অপরের চিন্তা ও মনের কথাও বলে দেন।

এ সব সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন—প্রাণায়ামের দ্বারা নাকি এরূপ সম্ভব।

এইরূপ অলৌকিক কাহিনীগুলির তবুও না হয় একটা করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু এমন আরও অনেক অলৌকিক কাহিনী আছে, যার অর্থই করা যায় না। যেমন স্বপ্ন, দৈব, জাতিস্মরের কথা ইত্যাদি। অবশ্য স্বপ্নে দৃষ্ট যেসব অলৌকিক কাহিনী ঘটে, স্বপ্ন-তত্ত্ববিদ্‌রা তারও একটা করে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তবুও স্বপ্ন মারফৎ এমন সব বিচিত্র অলৌকিক ঘটনা ঘটে, যার সূত্র কেউ ধরতেই পারেন না। আর দৈব ঘটিত অলৌকিক কাহিনীগুলিকে অনেকেও বিশ্বাসই করেন না। কিন্তু তবুও নাকি এসব ঘটে।

একজন জাতিস্বর দুগ্ধপোষ্য শিশুও তার পূর্ব জন্মের স্মৃতির বলে বড় বড় তত্ত্বকথা অনায়াসেই বলে যেতে পারে। অথচ অনেকে জন্মান্তর স্বীকার করেন না। কিন্তু জাতিস্মরও তো জন্মায়

আর একটা কথা, বিচিত্র বিচিত্র অলৌকিক ঘটনা যে শুধু আমাদের দেশের লোকের জীবনেই ঘটে, তা নয়। ইউরোপীয়ান, আমেরিকান প্রভৃতিদের জীবনেও ঘটতে শোনা যায়। এমন কি ঐসব দেশের সাহিত্যিকদের জীবনেও ঘটতে শোনা

গেছে। যেমন, এখানে একজন ইংরাজ সাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্সের কথাই বলি। ডিকেন্সের জীবনের অলৌকিক ঘটনাটি এই :—

একদিন ডিকেন্স স্বপ্ন দেখলেন, একটি ঘরে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেই ঘরে আরও কয়েকজন আছেন। আর সকলেরই পোষাকের রং গাঢ় লাল। ডিকেন্স পায়চারি করতে করতে হঠাৎ একটা হোঁচট্ খেলেন। হোঁচট্টা কোন রকমে সামলে নিয়ে তিনি পিছন ফিরে দেখেন, এক ভদ্রমহিলা তাঁর দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে আছেন। ডিকেন্স ভাবলেন—হোঁচট্টা সামলাতে গিয়ে হয়ত বা ভদ্রমহিলাকে ধাক্কা লেগে গেছে, তাই তিনি ভদ্রমহিলার কাছে ক্ষমা চাইলেন। ভদ্রমহিলা এবার তাঁর দিকে ফিরে শুধু বললেন—আমার নাম নেপিয়ার।

এইখানে ডিকেন্সের স্বপ্নও ভেঙ্গে যায়।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। ডিকেন্স একদিন সকালে তাঁর পড়বার ঘরে বসে পড়াশুনা করছেন, এমন সময় তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধু, এক ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে জিকেন্সের কাছে এলেন।

বন্ধুটি ভদ্রমহিলাকে বাইরে একটু দাঁড় করিয়ে রেখে, ডিকেন্সের কাছে গিয়ে বললেন—ঐ ভদ্রমহিলা তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে ধরেছেন। তুমি ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ কর।

ডিকেন্স সেই অপরিচিতা ভদ্রমহিলার কেবল লাল পোষাকের দিকে তাকিয়েই বন্ধুকে শুধু রসিকতা করবার জন্যই বললেন—উনি কি মিস্ নেপিয়ার?

বন্ধু শুনে চম্‌কে উঠে বললেন—তুমি কি তাহলে ওঁকে চেন নাকি?

জিকেন্স বললেন—না, মোটেই না।

—তবে নাম জানলে কি করে?

এবার ডিকেন্স তাঁর স্বপ্নের বিবরণটি বললেন।

বন্ধু শুনে অবাক হয়ে গেলেন। জিকেন্সও এরূপ একটা সফল স্বপ্নের কোন কারণ বার করতে না পেরে বিস্মিত হয়ে ভদ্রমহিলার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক কালের আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের এক অলৌকিক কাহিনী বলছি। ইনি স্যার এড্ওয়ার্ড মার্শাল হল। এই হল সাহেবের জীবনী পড়ে আলিপুর কোর্টের এক প্রবীণ উকিল আমায় কথা-প্রসঙ্গে সেদিন এঁর এই কাহিনীটি বলেছিলেন। কাহিনীটি এই :—

স্যার এড্ওয়ার্ড মার্শাল হল ইংলন্ডের একজন মস্ত বড় ক্রিমিনাল-ল-ইয়ার ছিলেন। কিছুকাল আগে তিনি মারা গেছেন। ১৯০৫/৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি একবার পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ভোটের ফল প্রকাশ হওয়ার আগে, একদিন তিনি ট্রেণে করে কোথায় যাচ্ছিলেন। তিনি ট্রেণে বসে তাঁর সামনে অপর রেল লাইন দিয়ে একটি মালগাড়ী যেতে দেখলেন। কি মনে ভেবে তিনি মাল

গাড়ীর বগীগুলো গণতে লাগলেন এবং একটি একটি করে গণে দেখলেন যে, গাড়ীটাতে ৭৩টা বগী আছে। গণা শেষ হলে, তাঁর মনে হল, তিনিও ৭৩টা ভোটে জিতেই পার্লামেন্টের সদস্য হবেন।

তারপর কিছুক্ষণ পরে ওই ট্রেনে যেতে যেতেই তাঁর একবার তন্দ্রার মত এল। তন্দ্রার ঘোরে তিনি এবার দেখলেন—তিনি যেন পার্লামেন্টের নির্বাচনে জিতে গেছ্নে, এবং একটা বিশেষ হলে, তাঁর কয়েকজন বন্ধু এসে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। তাঁর স্ত্রীও এসেছেন।

পরে নির্বাচনের ফল প্রকাশ হলে দেখা গেল—স্যার এড্ওয়ার্ড ঐ ৭৩টা ভোটেই জিতেছেন এবং তিনি তন্দ্রায় যে হলে এবং যে যে বন্ধুদের দেখেছিলেন, ঠিক সেই হলেই সেই বন্ধুরা সকলকেই এসে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। এবং তাঁর স্ত্রীও এসেছিলেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, কোন কোন মানুষ কখনো কখনো স্বপ্নেই হোক্, বা তন্দ্রাতেই হোক্, বা জাগ্রত অবস্থাতেই হোক্, তার ভবিষ্যতকে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। এসব যে কি করে হয়, তার ব্যাখ্যা করা কঠিন।

মানুষ যেমন স্বপ্ন বা তন্দ্রার মধ্যে ভবিষ্যৎ জানতে পারে, কোন কোন ইতর প্রাণীও বোধ করি মানুষের ন্যায় তার ভবিষ্যতের কথা বুঝতে পারে। এই ধরনের একটা লেখা একবার পড়েছিলাম। লেখাটি এইরূপ :—

একটা কুকুর একটা বড় গাছের তলায় পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, কুকুরটা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। উঠেই চারদিকে আশপাশে এবং উপরের দিকে নাগ নিয়ে কি যেন শুঁকতে লাগল। তারপর কি ভেবে তার পুরানো জায়গাটা ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে আবার শুল। তার শোবার সঙ্গে সঙ্গেই যে গাছতলায় সে আগে শুয়েছিল, সেই গাছের একটা মোটা ডাল, হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ল। কুকুরটা আগেই সরে গিয়েছিল, তাই সে বেঁচে গেল।

কুকুরে স্বপ্ন দেখে কি না জানি না। তবে একথা ঠিক যে, সে তার ঘুমন্ত অবস্থা থেকেই হঠাৎ জেগে উঠে, কিছু একটা হতে পারে বুঝেই সরে গিয়েছিল।

ইতর প্রাণীদের কথা বাদ দিলেও, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জীবনেই যেসব অলৌকিক ঘটনা ঘটে, মানুষ বিদ্যাবুদ্ধির অধিকারী হলেও সে সবরে সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করতে আজও অক্ষম।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি বহু পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। কয়েকজন কয়েকটি কাহিনীও আমাকে শুনিয়েছেন। এঁদের কাছে এবং ঐ সব পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার লেখদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বঙ্কিমচন্দ্রদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভ

চব্বিশ পরগণা জেলায় ইষ্টার্ণ রেলওয়ের নৈহাটি ষ্টেশনের সংলগ্ন কাঁটালপাড়া গ্রামে ১২৪৪ সালে ১৩ই আষাঢ় তারিখে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ এবং তাঁরও পূর্বপুরুষদের বাসভূমি ছিল, হুগলী জেলার কোন্নগরের নিকটবর্তী দেশমুখো গ্রামে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রপিতামহ রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের সম্পত্তি পেয়ে দেশমুখো থেকে কাঁটালপাড়ায় এসে বাস করেন। সেই থেকে রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশধরেরা কাঁটালপাড়ার অধিবাসী হন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা সংগ্রহ 'সঞ্জীবনী সুধা'র ভূমিকায় সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে তাঁদের বংশ পরিচয় এইভাবে লিখে গেছেন :

'অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব পুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব তীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন।'

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রদের বিখ্যাত কুলদেবতা শ্রীশ্রী ঁবিজয় রাধাবল্লভ জীউ এই রঘুদেব ঘোষালেরই প্রতিষ্ঠিত। রঘুদেব ঘোষাল কর্তৃক এই রাধাবল্লভ জীউ এর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শ্রীশতঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর "চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দেবতা। শ্রীশ্রী ঁবিজয় রাধাবল্লভ জীউ' প্রবন্ধে এইরূপ লিখেছেন :

'এখানে আমি আমাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রী ঁবিজয় রাধাবল্লভ জীউর সম্বন্ধে যাহা আমি আমার পিতামহীর নিকট শুনিয়াছিলাম, তাহারই পুনরুল্লেখ করিতেছি। যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি সেটা ১৭৪৮ খৃঃ। তখন রঘুদেব ঘোষাল জীবিত। এমন দিনে একদিন অপরাহ্নে এক সন্ন্যাসী শিষ্য সমভিব্যাহারে আমাদের গৃহ দেবতাকে একটি ঝুলির ভিতর লইয়া কাঁটালপাড়ায় আসিলেন। গ্রাম হইতে ফিরিয়া সন্ন্যাসী দেখিলেন, শিষ্যগণ নিদ্রিত, ঠাকুর ঘুরিয়া পশ্চিম মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সন্ন্যাসী

ইহা দেখিয়া বিরক্তির সহিত নিকটে যে সকল গ্রাম্য বালক খেলা করিতেছিল, তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন— আমার ঠাকুরকে কে ছুঁইয়াছে।

শিষ্যগণ সন্ন্যাসী ঠাকুরের বকাবকিতে জাগ্রত হইয়া দেখিলেন— ঠাকুর পশ্চিম মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

শিষ্যগণ ক্রোধান্বিত হইয়া বালকগণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং ঠাকুরকে ঘুরাইয়া পূর্বের অবস্থায় রাখিতে গিয়া দেখিলেন যে, দেবতা নড়েন না। সন্ন্যাসী ও শিষ্যগণ বিস্মিত হইলেন।

ক্রমে সন্ধ্যারতির সময় উপস্থিত হইল। যথারীতি সন্ধ্যারতি সমাপ্ত করিয়া বিগ্রহকে ভোগ দিয়া সন্ন্যাসী দেবতাকে শয়ন করাইলেন এবং নিজেরাও শয়ন করিলেন। সন্ন্যাসী নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলেন— রাধাবল্লভ সহাস্য মুখে বলিতেছেন— দেখ, আমাকে এখানে রঘুদেব ঘোষালের বাড়ীতে রাখিয়া যাও, আমি তার সেবাই চাই।

স্বপ্নান্তে সন্ন্যাসী চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, ঠাকুর সেইভাবেই শয়ান আছেন। তখনও তাঁহার কানে সেই কথা ঝঙ্কার দিতে ছিল।

পরদিন প্রাতে সন্ন্যাসী ঠাকুর বিগ্রহকে শয়ান হইতে উঠাইয়া শিষ্যদিগের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া রঘুদেব ঘোষালের বাড়ীতে আসিলেন। রঘুদেব ঘোষালের কাছে পূর্বরাত্রের স্বপ্নে বিবরণ বলিলেন।

শুনিয়া রঘুদেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন— তিনিও পূর্ব রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, যেন বিগ্রহ আসিয়া বলিতেছেন— দেখ্ তোর সেবায় অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, আমাকে তোর কাছে রেখে দে।— বলিতে বলিতে রঘুদেব বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন; এবং তখনই দেবতার ভোগাদির ব্যবস্থা করিলেন।

সন্ন্যাসীর কথামত রঘু দেবতার ভার গ্রহণ করিলেন। এবং অর্জুনার সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র চালা তুলিয়া দেবতা প্রতিষ্ঠা করিলেন।

সন্ন্যাসী রঘুদেবকে বলিলেন— আমি চলিলাম, ঠাকুরের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিও।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। রঘুদেব ঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন।

শতঞ্জীববাবুর লেখায় বর্ণিত এই 'অর্জুনা' রঘুদেব ঘোষালের বাড়ীর সংলগ্ন একটি বিরাট পুকুর। রঘুদেব এই পুকুরটির মালিক ছিলেন।

এই 'অর্জুনা' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর "অর্জুনা পুষ্করিণী" প্রবন্ধে লিখেছেন :

অর্জুনা পূর্বে সুবৃহৎ জলাশয় ছিল, জল দেখা যাইত না, পদ্মপত্রে ঢাকা থাকিত, আর উহার উপর অসংখ্য পদ্মফুল বায়ুতাড়িত হইয়া দুলিত। চারিদিকের পাড় আম্র

কাননে সুশোভিত। এই আম্র বনের গাছে গাছে অসংখ্য পাখী বাস করিত। প্রাতে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় সকল সময়েই তাহাদের কলরবে ওই নির্জন সরোবরের চির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইত।

এই পুষ্করিণী এক্ষণে মজিয়া সঙ্কীর্ণ আয়তন হইয়াছে এবং পাড়ে পাড়ে প্রজা বসিয়াছে। ইহার সে রম্যতা আর নেই।

অর্জুনার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রদিগের ফুলবাগান ছিল।... বঙ্কিমচন্দ্র এই ফুল বাগান ও পুষ্করিণীর পাড়ে বেড়াইতে ভালবাসিতেন।

অনেকে এই অর্জুনাকেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের বারুণী পুষ্করিণী বলে থাকেন।

গৃহদেবতা রাধাবল্লভের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের সুগভীর বিশ্বাস ছিল। 'নবজীবন' - সম্পাদক অক্ষয় সরকারের নিকট তিনি রাধাবল্লভের অলৌকিকতা সম্বন্ধে অশ্রুপূর্ণ-হৃদয়ে প্রায়ই গল্প করতেন। অন্যান্য বন্ধুদের নিকটও তিনি রাধাবল্লভের কথা বলতেন এবং বলতে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর লিখিত অনেক চিঠিপত্রের মধ্যেও রাধাবল্লভের উপর তাঁর গভীর বিশ্বাসের কথা রয়েছে। তিনি নিজ ব্যয়ে একবার রাধাবল্লভের মন্দিরও ভালরূপে সংস্কার করে দিয়েছিলেন।

রাধাবল্লভের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাসের কথা প্রসঙ্গে তাঁর স্নেহভাজন বন্ধু, সে যুগের বিখ্যাত সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন :

'নবমী পূজার দিন প্রাতে গিয়াছি, সঞ্জীববাবু, বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি পূজার দালানে বসিয়া আছেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া বসিতে যাইতেছি, বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'তা হবে না, রাধাবল্লভকে প্রণাম করিয়া আসিয়া ব'স।' বঙ্কিমচন্দ্র এই বিগ্রহের কথা কহিতে বড় ভালবাসিতেন, বলিতেন— উনি আমাদের বংশের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করেন। সমস্ত দুর্গতিনাশ করেন। আমাদের সকল কথা শুনেন, আব্দার রক্ষা করেন, রোগে শোকে বিপদে আমরা উঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি, উঁহাকেই ধরি, উনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন।' এমন সরলভাবে এমন ভক্তিভাবে রাধাবল্লভের কথা বলিতেন যে, শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষে জল আসিত। একবার বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর একখানি অলঙ্কার চাহিয়া পাঠাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন—'অলঙ্কারখানি এখন পাইবে না। আমার আরোগ্য কামনা করিয়া আমার স্ত্রী উহা রাধাবল্লভের নিকট বন্ধক রাখিয়া ছিলেন, এখনও উদ্ধার হয় নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখেছেন :

যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আসন্ন-প্রসবা, তখন তিনি রাধাবল্লভের মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া সাশ্রুনয়নে ঠাকুরকে কত ডাকিয়াছিলেন.... তারপর দুই বৎসর যাইতে না যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আবার কাতর হইয়া রাধাবল্লভের চরণে পড়িতে দেখিলাম। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র কঠিন রোগগ্রস্ত মরণাপন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রিশেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রিতাবস্থায় নবদূর্বাদলশ্যাম বংশীবদন রাধাবল্লভকে স্বপ্নে দেখিলেন। পরদিন ঠাকুরের নির্মাল্য আনিয়া শিশুর মাথায় দিলেন। শিশু অচিরে আরোগ্য লাভ করিল।"

'নবজীবন'-সম্পাদক চুঁচুড়ার অক্ষয় সরকার একদিন রাধাবল্লভের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস্যপূর্ণ কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রকে কি একটা জেরা করেছিলেন। তাঁর কথার ভঙ্গীতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তারপর অক্ষয়বাবুর কথার জবাবে তিনি এই কাহিনীটি বলেছিলেন :

একটা কথা মনে পড়ে অক্ষয়, তোমাদের চুঁচুড়ার একটি সুবর্ণ বণিকের প্রৌঢ়া রমণী, একবার উল্টা রথের তিন দিন আগে রাধাবল্লভকে দেখতে এসেছিল। রাধাবল্লভ তখন ছিলেন গুঞ্জঘরে। গুঞ্জঘরের দ্বারে এসে মহিলাটি রাধাবল্লভকে দেখতে পেল না। ব্যাপারটার মধ্যে কারও কোন কৌশল কিছুই ছিল না। মহিলাটির দৃষ্টিশক্তিও বেশ প্রখর ছিল, উপরন্তু বিগ্রহ ও তার মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র তিন চার হাতের। কিন্তু তথাপি সে দেখতে পেল না। তখন উপস্থিত অন্যান্য দর্শকদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। তারা সকলেই অত্যন্ত বিহ্বল হ'য়ে পড়ল। সকলের মুখেই এক কথা— হায় হায় ঠাকুরের একি লীলা

ঐ সময় আমি এবং আমার ছোটভাই পূর্ণচন্দ্র আমরা উভয়েই চুঁচুড়ায় কাজ করতাম। এবং আমরা উভয়েই প্রত্যহ বাড়ী থেকে অফিস যাতায়াত করতাম। ঐদিন ঠিক ঐ সময়টায় আমি তখন কয়েকজন বন্ধু সহ আমার বৈঠকখানায় গল্প করছিলাম। কলরব শুনে সকলেই গুঞ্জঘরে ছুটে গেলাম। প্রকৃত অবস্থা দেখে আমিও অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমার মুখ দিয়ে সহসা কোন কথা বেরুল না।

তখন রাধাবল্লভের পূজা হচ্ছিল। একটু পরে আত্মসংবরণ করে আমি পূজারীকে ডেকে বললাম—রাধাবল্লভের চরণে একটা ফুল দাও তো

ফুল দেওয়া হ'ল। তখন আমি সেই প্রৌঢ়াকে সম্বোধন করে বললাম— এইবার দেখতো বাছা।

মেয়েটি উত্তরে বললে— আমি ফুল দেখছি। কিন্তু ঠাকুর কই?

আমি আবার প্রশ্ন করলাম— কিসের উপর ফুল দেখছ?

মেয়েটি বললে— কালো একটা পাথরের উপর।

কালো পাথরটি রাধাবল্লভের পদ্মাসন। এই পদ্মাসনের উপর ঠাকুরের চরণ স্থাপিত। ফুল দেওয়া হয়েছিল তারই উপর। ঐ প্রৌঢ়া রমণী পদ্মাসনও দেখেছিল, ফুলও দেখেছিল, কিন্তু দেখল না কেবল সেই দুর্লভ চরণ যুগল।

অভাগিনী কপালে করাঘাত করে কেঁদে উঠল। দর্শকবৃন্দের চোখের পাতা অশ্রুসিক্ত হ'ল। আমার চোখের পাতাও শুক্‌নো রইল না।

এই কাহিনীটি অক্ষয়বাবুর কাছে বলবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র রীতিমত কেঁদেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এইরূপ বিগ্রহভক্তিতে অক্ষয়বাবুর হৃদয়ও সেদিন ভাবে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

এই কাহিনীটি অক্ষয় সরকার স্বকর্ণে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে শুনেছিলেন। পরে তিনি এই কাহিনীটি ১৩১৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার পুনর্জীবন লাভ

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বয়স তখন ১৮ বৎসর। সেই সময় যাদববাবু একদিন তাঁর পিতামাতা কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে রাগ করে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যান। যাদববাবু বাড়ী ছেড়ে উড়িষ্যার যাজপুরে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে চলে যান। কাশীনাথবাবু তখন যাজপুরে নিম্কীর দারোগা (সল্ট সাব-ইন্‌সপেক্টর) ছিলেন। যাদববাবু পায়ে হেঁটেই বাড়ী থেকে যাজপুরে গিয়েছিলেন।

যাদববাবু যাজপুরে গেলে কাশীনাথবাবু ছোট ভাইকে কাছে রাখলেন। কাছে রেখে বাড়ীতে বাপমাকে খবর দিলেন। কাশীনাথবাবু অল্পদিনের মধ্যেই যাজপুরে যাদববাবুকে একটি সরকারী চাকরিও জোগাড় করে দিলেন।

যাদববাবু চাকরি করেন এবং দাদার কাছে থাকেন। এইভাবে কিছুদিন কাটে। এমন সময় একবার তাঁর কানে একটা মারাত্মক রকমের কর্ণমূল হয়। ঐ কর্ণমূল রোগেই যাদববাবুর শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়।

কাশীনাথবাবু শোকার্ত হৃদয়ে বৈতরণী তীরে ছোটভাইয়ের শবদাহের ব্যবস্থা করলেন। চিতায় শব সাজানো হয়েছে, মুখাগ্নি হবে, ঠিক এমনি সময়ে কোথা থেকে এক সাধু এসে কাশীনাথবাবুকে বললেন— শব নামাও, ওকে আমি বাঁচিয়ে তুলব।

সাধুর কথায় উপস্থিত সকলেই কৌতূহলী হয়ে শব নামালেন। তখন সাধু মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করে কিভাবে মৃত যাদববাবুর দেহে আবার প্রাণ এনে দিলেন।

এই দেখে সকলেই মহা বিস্মিত হলেন।

এদিকে যাদববাবু সুস্থ হয়ে বসেই সাধু চলে যাচ্ছেন দেখে, তাঁকে ছাড়তে চাইলেন না।

তখন সাধু যাদববাবুকে দীক্ষা দিলেন এবং বলে গেলেন— আবার তোর সঙ্গে আমার একাধিকার দেখা হবে। তোর মৃত্যুর আগেও একবার দেখা হবে। তোর এক মহানামী পুত্র হবে। তার জন্যেই তোর বংশের নাম চিরস্থায়ী হবে। তুই অতি বৃদ্ধ বয়সে তোর প্রপৌত্রের মুখ দেখে তবে মারা যাবি, ইত্যাদি।

দীক্ষা দেওয়ার সময় যাদববাবুর কাছ থেকে দুটি জিনিষ চেয়ে নিয়েছিলেন। এবং সেই জিনিষ দুটি তিনি একটি পরিষ্কার কাপড়ে জড়িয়ে জীবন ভোর (তিনি ৮৮ বৎসর বেঁচেছিলেন) পূজা করেছিলেন। ঐ কাপড়ের মধ্যে কি আছে, কেউই জানতো

না। যাদববাবুর মৃত্যুর পর ঐ কাপড়ের পুঁটুলিটি খুলে দেখা যায় যে, একটি পৈতা ও একপাটি খড়ম। এগুলিকে তাঁর মৃত্যুর পর গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল।

সাধু যাদববাবুকে যা যা বলেছিলেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সবই ফলেছিল।

যাদববাবুর এই পুনর্জীবন লাভের কাহিনীটি সেকালের অনেকেই জানতেন।

এই কাহিনীটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"আমার পরম পূজনীয় ঁবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃদেব ওঁ ঁযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিষ্ণুপাদের যৌবনের প্রারম্ভেই প্রথম প্রাণ বিয়োগ হয়। কিন্তু সে প্রাণ পুনরায় দেহে ফিরিয়া আইসে। ইহার বহু বৎসর পরে অর্থাৎ তাঁহার ৮৮ বৎসর বয়সে যথার্থ দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল। এ কথা অনেকে জানেন। কারণ সাহিত্যে এ সম্বন্ধে অল্পাধিক চর্চা হইয়াছে। উক্ত 'পরম পূজনীয়ের' দেহত্যাগের পর আমার প্রিয় সুহৃদ সাহিত্যজগতে সুপরিচিত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় 'প্রতিভা পূজা' নামে একখানি শোকসূচক কবিতা পুস্তিকা লেখেন। তাহাতে পূর্ব কথিত 'পিতৃদেবের' প্রথম প্রাণত্যাগ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন

উৎকলের উপকূলে অই
        শব এক রয়েছে শায়িত,
পার্শ্বে চিতা হতেছে নির্মাণ
        শবেরে করিতে ভস্মীভূত।
কোথা হতে যোগী একজন
        আসি তেজে ভাতি চারিভিত,
শবে প্রাণ করিল অর্পণ
        সবে হেরি হইল স্তম্ভিত।
নিজ তেজে পূত করি তারে
        মন্ত্রে শেষে করিল দীক্ষিত,
'শক্তি' তাঁর পুণ্য আকর্ষণে
        বংশে তার হল আবির্ভূত।

...প্রাণশূন্য দেহে প্রাণকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। সে দেহ হইতে বহু পূর্বেই প্রাণ চলিয়া গিয়াছিল। সে এতক্ষণ যে, তাহার পর উদ্যোগ করিয়া শবদেহ ঘাটে আনিতে হইয়াছিল, অল্প সময়ের কার্য নহে।

...একদিকে সজ্জিত চিতা, আর অপরদিকে দীক্ষাদান— সেই সন্ন্যাসী কর্তৃক নবজীবন সঞ্চারিত দেহে অবশ কর্ণে (অবশ কর্ণ, বলিব কি?) মৃত সঞ্জীবন নাম দান। কি অদ্ভুত ছবি

... সন্ন্যাসী দূর ভবিষ্যতে যাহা যাহা হইবে, এমন কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকটিই ফলিয়াছিল।"

যাদবচন্দ্রের গৃহে লক্ষ্মীর আগমন

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মাতা দুর্গাদেবীও ঠিক তেমনি আচার নিষ্ঠা-পরায়ণা ধর্মশীলা মহিলা ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শতঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই দুর্গা দেবী সম্বন্ধে লিখেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের মাতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপিণী ছিলেন।" সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিষচন্দ্রও (শতঞ্জীববাবুর পিতা) বলেছেন :

যখন পিতামহী লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী পরিয়া, বাউটি ঝুলাইয়া ফাঁদি নথ নাকে দিয়া গৃহিণীপণা করিতেন, তখন সত্যই তাঁহাকে লক্ষ্মী সদৃশ দেখাইত।.... পিতামহীর মুখে কিছুমাত্র অপবিত্র ভাব দেখি নাই।

যাদবচন্দ্র এবং দুর্গাদেবী উভয়েই ধর্মপথে চলার জন্য তাঁহাদের গৃহে এক সময় না কি লক্ষ্মীর আগমন হয়েছিল। এই লক্ষ্মীর আগমন সম্বন্ধে সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শতঞ্জীবচন্দ্র এইরূপ লিখেছেন :

বঙ্কিম-জননী দুর্গাদেবী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন কাঁটালপাড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশ ধনে, মানে, মর্যাদায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল। দুর্গাদেবীর স্বর্গলাভের পর সেই শ্রী ক্রমে দিনে দিনে ম্লান হইয়া আসিল। শেষ যেটুকু ছিল, তাহা কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার আদর্শ, ভগবদ্ভক্তি ও ধর্মানুরাগের জন্য। যেদিন যাদবচন্দ্র স্বর্গলাভ করেন অর্থাৎ ১৩ই মার্চ ১২৮৭ সাল, বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে, তাহার অব্যবহিত পরেই চট্টোপাধ্যায় পরিবার দিনে দিনে লক্ষ্মীহীন, শ্রীহীন হইতে আরম্ভ করে। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের বাড়ী হইতে লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সহজ ইংরাজী ভাষায় একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

জ্যোতিষচন্দ্র "দি হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন" নামক পত্রের ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের সংখ্যায় "গডেস্ লক্ষ্মী ইন্ এ হিন্দু হোম্" নাম দিয়ে এক প্রবন্ধে এই কাহিনীটি লিখেছিলেন। তাঁর সেই ইংরাজী প্রবন্ধটির মর্মার্থ এইরূপ :

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়কার একদিনের সন্ধ্যাবেলাকার ঘটনা। সেদিন সন্ধ্যার সময় কাঁটালপাড়ার গ্রাম প্রান্তে এক পুকুর ঘাটে গ্রামের কয়েকজন

মহিলা তখন গা ধোয়া, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময় প্রায় ১৬ বৎসর বয়স্কা দেবীপ্রতিমার মত এক অপূর্ব সুন্দরী নারী ঘাটের কাছে এসে ঘাটের মহিলাদের জিজ্ঞাসা করলেন— এই পথে গেলেই কি যাদব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে যেতে পারব?

ঘাটের মহিলারা উত্তর দিলেন— হ্যাঁ।

উত্তর পেয়েই সেই দেবীপ্রতিমা সেখান থেকে চলে গেলেন বা হঠাৎ যেন অন্তর্ধান হলেন।

এদিকে পুকুর ঘাটের মহিলারা সকলেই ঐ অপরিচিতার হঠাৎ আগমন ও তাঁর অন্তর্ধান এবং সর্বোপরি তাঁর রূপরাশি দেখে মহা বিস্মিতা হলেন। এমন ভর সন্ধ্যার সময় যাদববাবুর বাড়ীতে দেবী প্রতিমার মতো কে ওই নারী এলেন, দেখবার ও জানবার জন্য তাঁদের সকলেরই বড় কৌতূহল হ'ল। তাই তাঁরা ঘাট থেকে সিধা একেবারে যাদববাবুর বাড়ীতে এলেন। এসে তাঁরা যাদববাবুর স্ত্রী দুর্গাদেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন— আপনাদের বাড়ীতে কে ওই অপূর্ব সুন্দরী নারীটি এলেন?

দুর্গাদেবী বিস্মিতা হয়ে বললেন— কই, কেউ তো আসেন নি।

তখন তাঁরা দুর্গাদেবীকে সব কথা বললেন।

এরপর দুর্গা দেবী বাড়ীর সকলকেই একে একে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা কাকেও আসতে দেখেছেন কি না।

সকলেই বললেন,— অপরিচিতা কাকেও বাড়ীর মধ্যে আসতে তাঁরা দেখেন নি।

পুকুর ঘাট থেকে আগত মহিলারা এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দুর্গাদেবীকে বললেন— তা হলে তিনি আর কেউ নন, মা লক্ষ্মী স্বয়ং। আজ থেকে তিনি আপনাদের বাড়ীতে অধিষ্ঠিতা হলেন।

দুর্গাদেবী তাঁর স্বামীর ন্যায় অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন। তিনি তাঁর ধর্ম স্বভাব বশতঃ প্রতিবেশিনীদের কথাটা বিশ্বাসও করলেন। তাই তখনই তিনি শাঁখ এনে মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর প্রত্যেকটি কক্ষে, সিঁড়িতে, আশে পাশে, চারিদিকে আলো জ্বেলে দিলেন। আর ধূপ ধূনা প্রভৃতি দিয়ে সমস্ত বাড়ী সুগন্ধময় করে তুললেন।

এরপর তিনি বাড়ীর মূল প্রবেশ পথটিকে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিকিয়ে সেখানে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন এবং দেবদেবীর সামনে লোক যেমন হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনিভাবে তিনি প্রবেশ পথের দরজা কাছে জোড় হাতে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দুর্গাদেবী পরে তাঁর স্বামীকে সমস্ত কথা জানালে, তাঁর ধর্মপ্রাণ স্বামীও ঐ ঘটনাটিকে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরই আগমন বলে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করলেন।

এদিকে 'স্বয়ং লক্ষ্মী যাদববাবুর বাড়ীতে এলেন' এই কথাটা ঘাটের সেই মহিলাদের মুখ থেকে প্রচারিত হওয়ায়, সেদিন রাত্রেই এবং বিশেষ করে তার পরদিন থেকে কৌতূহলী বহু নরনারী যাদববাবুর বাড়ীতে এসে ভীড় করতে লাগল। এইভাবে কদিন ধরেই বহু লোক এল গেল।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, ঐ স্মরণীয় সন্ধ্যার পর থেকে যত দিন যেতে লাগল, ধনে, মানে ও মর্যাদায় যাদববাবুর বংশের দিনে দিনে ততই উন্নতি হতে লাগল, এবং উন্নতির চরম সীমায় গিয়ে উঠল। এই মান, সম্মান নিয়ে ঐ বংশ প্রায় ২৫ বৎসর দেশের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়ে রইল।

২৫ বৎসর পরে যাদববাবুর স্ত্রী দুর্গাদেবী মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পরে যাদববাবুর বাড়ীতে আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সেদিন রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। যাদববাবুর দ্বিতীয় পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র নীচে বা'র বাড়ীর বৈঠকখানা থেকে ভিতর বাড়ীতে এসে সিঁড়ি বেয়ে উপরে দোতলায় আসছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন, এক মহিলা তাঁর পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন। সিঁড়িতে সঞ্জীবচন্দ্র মহিলাকে পাশ দিয়েই, এত রাত্রে কে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছেন, দেখবার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই পিছন ফিরে তাকালেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তিনি কাউকে আর দেখতে পেলেন না। সঞ্জীববাবু বিস্মিত হয়ে উপরে উঠে এসেই কে নীচে নেমে গেলেন, একথা বাড়ীর মেয়েদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন, তাঁরা কেউই যান্‌নি, আর বাইরের কেউও বাড়ীতে আসেন নি।

যাই হোক্, সঞ্জীবচন্দ্র এ নিয়ে আর কোন খোঁজ করলেন না। এবং ক্রমে একথা ভুলেও গেলেন।

ঐ সময় সজীবচন্দ্র একদিন কিন্তু স্বপ্ন দেখলেন— সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে-যাওয়া মহিলা তাঁকে বলছেন—আমি লক্ষ্মী, তোমাদের বাড়ী ত্যাগ করেছি। কেননা আমার এ বাড়ী ছাড়বার সময় হয়েছিল। তাই—এ ছাড়া তিনি আর কিছু বললেন না।

পরদিন সকালেই সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে একথা বললেন। শুনে যাদববাবু খুব বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজার আয়োজন ক'রে মহা আড়ম্বরের সহিত লক্ষ্মীপূজা করলেন। কিন্তু লক্ষ্মী আর ফিরে এলেন না। এর কিছুদিন পরেই যাদববাবুও মারা গেলেন।

এরপর থেকেই ঐ বংশের পরিপূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা দিনে দিনে ম্লান হয়ে আসতে লাগল। যাদবচন্দ্রের পুত্রদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ দেখা দিল এবং গত প্রায় ২৫ বৎসরের মধ্যে বংশে যে মৃত্যুসংখ্যা একরূপ ছিলই না, এবার ঐ বংশে কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকেরই মৃত্যু হ'ল।

এই হ'ল জ্যোতিষচন্দ্রের লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধটির মর্মার্থ।

জ্যোতিষচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হ'লে নায়ক-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধটি পড়ে তখনকার 'নায়ক' পত্রিকায় লিখেছিলেন :

বাগবাজার পত্রিকা অফিস হইতে একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র বাহির হয়। তাহার নাম Spiritual Magazine. জে, চ্যাটার্জী নাম দিয়া একজন ইহাতে একটি গল্প লিখিয়াছেন। গল্পটি পড়িয়া বুঝিলাম যে, উহা কাঁটালপাড়ার ঁ যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর কথা। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনুমান করিলাম যে, লেখক সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিষ। আজকালকার শিক্ষিত বাবু সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের নামই প্রকট। পরন্তু দক্ষিণ বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ সমাজে রায় বাহাদুর বলিলে, কেবল যাদব চাটুজ্যে মহাশয়কে বুঝাইত। চাটুজ্যে মহাশয়ের সেই বিপুল সংসার, সেই সদা উৎসব পরিপূর্ণপুরী, সেই বার মাসে তের পার্বণের সমারোহ, সহসা এমনভাবে নিবিয়া গেল কেন? ইহার উত্তরে হালিসহর ভাটপাড়া ও কাঁটালপাড়ার লোকেরা বলে যে, যাদব চাটুজ্যের বাটিতে মা লক্ষ্মী স্বয়ং আসিয়া বসিয়াছিলেন। কর্তা ও গৃহিণী চলিয়া গেলেন। ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ সর্বভূক বাবু হইলেন। তুলসীর মালা গলায় দেওয়া ব্রাহ্মণ এবং শ্রীশ্রীরাধা বল্লভ জীউর সেবক ও সাধক চট্টোপাধ্যায় পুত্রগণ মুরগী মটন ... না হইলে দিন যাপন করিতেন না। তাই মা লক্ষ্মী রাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। সঞ্জীবচন্দ্র মা লক্ষ্মীর গমনটা দেখিয়াছিলেন। সেই গল্পটা ম্যাগাজিনে জ্যোতিষ ভায়া যেন চাঁচা ছোলা ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছেন। আমরা বাল্যকাল হইতেই এ গল্প জানিতাম। পিতামহীর মুখে শুনিয়াছিলাম। পরে লক্ষ্মীর নির্গমন বার্তাও মহিলাদিগের মুখে আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। আমরা পাঠকবর্গকে এই গল্পটি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্রবধূর পুনর্জীবন লাভ

যাদবচন্দ্রের পুনর্বার জীবনলাভের ঠিক ১২৩ বৎসর পরে তাঁর বংশে এই ধরণের আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। সে ঘটনাটি এইরূপ :

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র পুত্রের নাম জ্যোতিষচন্দ্র। এই জ্যোতিষচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীজীবঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বি, এল। এই জীবঞ্জীববাবুর প্রথমা স্ত্রী রোগাক্রান্ত হয়ে ১৩৪০ সালের ২৭শে কার্তিক তারিখে মধ্যরাত্রে কলকাতায় মারা যান।

জীবঞ্জীববাবুর স্ত্রী কয়েকটি শিশু সন্তান রেখেই মারা গেলেন। সেইজন্য শব শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় জীবঞ্জীববাবু শ্মশানে না গিয়ে ছোট ছোট পুত্র-কন্যাগুলিকে নিয়ে বাড়ীতে রইলেন। জীবঞ্জীববাবুর আত্মীয় ও বন্ধুরাই শব নিয়ে কাশীমিত্রের শ্মশান ঘাটে গেলেন।

মৃতদেহ যখন শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন প্রায় ভোর হয়ে আসে।

শব বাহকরা শ্মশানে শব রেখে, একটু পরে দল বেঁধে, অদূরেই একটা চায়ের দোকানে চা খেতে যান। তাঁরা কেবল দলের একজনকে— তিনি কলকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট রবীন্দ্রকুমার লাহিড়ী— শবের কাছে রেখে গেলেন।

রবীনবাবু একা বসে থেকে থেকে একবার শবের মুখের দিকে চাইতেই হঠাৎ দেখতে পেলেন, শবের ডান চোখের পাতাটা যেন নড়ে উঠল। এই দেখে তিনি মহা বিস্মিত হলেন।

ইতিমধ্যে দলের সকলেই চা খেয়ে ফিরে এলেন। তখন রবীনবাবু ঐ চোখের পাতা নড়ার কথা তাঁদের বললেন।

রবীনবাবুর কথা শুনে সকলেই হেসে উঠলেন। কেউ কেউ বললেন— তোমার এখনও ঘুম কাটেনি। গঙ্গায় গিয়ে ভাল করে চোখে মুখে জল দিয়ে এস।

এই কথা বলে কিন্তু তাঁরা এবার মৃতার মুখের দিকে চাইলেন। আশ্চর্য ব্যাপার যে, তাঁরাও চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলেন, সত্যই মৃতার ডান চোখের পাতাটি নড়ছে। আর শুধু তাই নয়, মৃতা হাত নেড়ে তুলে পাশ ফিরে শুলেনও।

এই দেখে সকলে বেশ বিস্মিত হলেন।

রবীনবাবু তখনই ছুটলেন, কাছে কোথা থেকেও, জীবঞ্জীববাবুকে টেলিফোন করতে।

জীবঞ্জীববাবু ফোনে এই সংবাদ পেয়েই, যে ডাক্তার তাঁর স্ত্রীকে দেখছিলেন, সেই ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে তখনই শ্মশানে এলেন।

ডাক্তার শ্মশানে এসেই সব দেখে জীবঞ্জীববাবুকে একটা ওষুধ কিনতে দিলেন।

জীবঞ্জীববাবু সেই ওষুধ আনলে ডাক্তার জীবঞ্জীববাবুর স্ত্রীকে একটা ইন্‌জেক্‌সান দিলেন।

জীবঞ্জীববাবুর স্ত্রী চোখ চেয়েই তিনি কোথায় এসেছেন, একথা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন।

ডাক্তার বললেন— আপনাকে অসুস্থ দেখে, আপনার স্বামী আপনাকে গঙ্গার ধারে বেড়তে এনেছেন।

এদিকে মৃতা পুনর্জীবন লাভ করেছে, এই সংবাদ রটনা হওয়ায় শ্মশান ঘাট লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

যাই হোক, জীবঞ্জীববাবু দুর্বল স্ত্রীকে গাড়ীতে করে বাড়ী ফিরিয়ে আনলেন। বাড়ীতেও ঐরূপ লোকের ভীড় জমতে লাগল।

বাড়ীতে এসে জীবঞ্জীববাবুর স্ত্রীর কিছু দুধ খেয়ে নিদ্রা গেলেন।

নিদ্রা ভাঙ্গলে জীবঞ্জীববাবু স্ত্রী কাছে গিয়ে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল জানতে চাইলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেছিলেন যে, কয়েকজন কালো কালো ষণ্ডামার্কা লোক তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। তিনি কিছুতেই যাবেন না, তবুও তারা জোর করেই তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। যাবার সময় তিনি নানাদেশের উপর দিয়ে যান। গিয়ে শেষে যেখানে উপস্থিত হন, সে একটা বড় হল ঘর। সেখানে অনেক লোকজন ছিল। গেলে একজন একথালা ভাত এনে তাঁকে খেতে বলে। কিন্তু তিনি খেতে চান না। ঐসময় এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধা সেখানে আসেন। বৃদ্ধ ঐ কালো কালো ষণ্ডামার্কা লোকগুলোকে বলেন— আরে, এ কাকে এনেছিস রে, রেখে আয়, রেখে আয়।— এই বলতেই লোকগুলো আবার তাঁকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনল। আনবার সময় দেউড়ির কাছে ঐ বৃদ্ধা তাঁর আঁচলে কি বেঁধে দিয়ে বললেন— যা, যাবার সময় এইগুলো খেতে খেতে যা।— এরপর লোকগুলো তাঁকে খানিক দূর এনে উপর থেকে যেন ঠেলে নীচে ফেলে দিল।

জীবঞ্জীববাবু সব শুনে বললেন— বুড়ী তোমার আঁচলে কি বেঁধে দিয়েছিল দেখেছিলে?

জীবঞ্জীববাবুর স্ত্রী তাঁর স্বামীর এই কথায় এবার তাঁর আঁচল খুলে দেখলেন, তাতে কিছু চাল বাঁধা রয়েছে।

জীবঞ্জীববাবু বললেন— চাল কোথা থেকে এল?

তাঁর স্ত্রী বললেন যে, ঐ বুড়ীই নিশ্চয় এই চাল বেঁধে দিয়েছে।

জীবঞ্জীববাবুর স্ত্রী মারা গেলে, মৃতাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আগে মৃতাকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন জীবঞ্জীববাবুর শ্যালকের স্ত্রী। জীবঞ্জীববাবু এবার তাঁর শ্যালকের স্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি কি তোমার ননদিনীকে বিদায় দেবার সময় তার আঁচলে চাল বেঁধে দিয়েছিলে?

ভদ্রমহিলা শুনে মহা বিস্মিতা হয়ে বললেন— শোন কথা, মড়ার আঁচলে চাল বেঁধে দিতে যাব কেন?

জীবঞ্জীববাবুর স্ত্রীকে যে সাজে শ্মশানে পাঠানো হয়েছিল, শ্মশান থেকে ফিরিয়ে এনে সেই সাজেই তাঁকে বিছানায় শুইয়ে রাখা হল। দুর্বলতার জন্য তাঁর কোন কাপড়-চোপড় বদলে দেওয়াও হয়নি।

তাই জীবঞ্জীববাবু শুনে মহা বিস্মিত হয়ে গেলেন।

জীবঞ্জীববাবুর স্ত্রীর এই কাহিনীটি সেই সময় কলকাতার বাঙ্গলা, ইংরাজী অনেক দৈনিক পত্রিকাতেই সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছিল।

জীবঞ্জীববাবুর স্ত্রী এই ঘটনার পর কিছুদিন বেঁচেও ছিলেন। জীবঞ্জীববাবু তাঁর পিতৃবন্ধু হীরেন্দ্র নাথ দত্তর আদেশ ক্রমে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুঘটিত এই অলৌকিক কাহিনীটি নিয়ে "জীবন নদীর ওপারে" নাম দিয়ে একটি পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন।

জীবঞ্জীববাবুর স্ত্রীর সত্যই মৃত্যু হয়েছিল কি না, আমি একথা জীবঞ্জীববাবুকে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেছিলেন যে, মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণই মৃতার মধ্যে তাঁরা দেখেছিলেন এবং মৃতার শরীর শক্ত হয়ে যাওয়ার পরই তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

নবীনচন্দ্রের বর্ণিত "অলৌকিক কার্য"

চট্টগ্রাম জেলায় নয়াপাড়া গ্রামে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। নবীনচন্দ্র যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসর তাঁদের নিজেদের বাড়ী সহ গ্রামের সমস্ত লোকের বাড়ী পুড়ে যায়। এর পরেও কয়েকবার প্রায় প্রতি বৎসরই নবীনচন্দ্রদের বাড়ী পোড়ে। নবীনচন্দ্রের পিতা শেষে এক সাধুর সাহায্যে তাঁদের ঐ বাড়ী পোড়া নিবারণ করেন। এ সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র তাঁর "আমার জীবন" নামক আত্ম-জীবনীতে "অলৌকিক কার্য" নাম দিয়ে এইরূপ লিখে গেছেন :

..... আমার জন্মের অব্যবহিত পরেই আমাদের গ্রামশুদ্ধ ভস্মীভূত হয়। তাহার পর আট দশ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত আটবার আমাদের বাড়ী এবং শহরের বাসাবাড়ী পুড়িয়া যায়। এক একবার এমনি হইত বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে, সংবাদ শুনিয়া বাড়ী গিয়াছি, পরদিন বাড়ীতে শুনিলাম, শহরের বাসা বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে, অথচ উভয় স্থলে দৈবিক আগুন। আমাদের বংশে পাকা বাড়ী করিবার নিয়ম ছিল না। তাহার কারণ আদি-পুরুষ শ্রীযুক্ত রায় দশভুজার পাকা মন্দিরে কাটা পড়িয়া ছিলেন। তাহার পর যিনি পাকা বাড়ী করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার কোনও না কোন অমঙ্গল হওয়াতে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভূত হইয়া গিয়াছিল। অতএব সকলেরই মাটির ও বাঁশের ঘর। প্রথমবার অগ্নিতে অনেক পুরাতন, বহুমূল্য ও বহু কারুকার্য যুক্ত বাঁশের ঘর ধ্বংস হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য গল্প বলিব। আমার বয়স যখন অনুমান দশ বৎসর, তখন চট্টগ্রামে পশ্চিম অঞ্চল হইতে শঙ্করপুরী স্বামী নামক একজন সন্ন্যাসী উপস্থিত হন। তিনি ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় এবং ভক্তিভাজন। এমন প্রশান্ত, গম্ভীর, চিন্তাশীল, উন্নত মূর্তি আমি দেখি নাই। আমি তাঁহার কাছে সন্ন্যাস নিয়মে কর্পূরালোকে সর্বাগ্রে দীক্ষিত হইলাম। তাহার পর এ অঞ্চলে তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। এই সময় একবার আমাদের বাসা পুড়িয়া গেল। পুরী বাবাজী উপর্যুপরি এই অগ্নিকাণ্ডের কথা শুনিয়া আমাদের বাড়ী যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পিতা তাঁহাকে লইয়া গেলেন। ঠাকুর ঘরের ভিটাতে একটি আচ্ছাদন নির্মাণ করিয়া তাঁহাকে থাকিতে দেওয়া হইল। পরদিন প্রাতে তিনি পিতাকে বলিলেন— আমি পিতার কাছে শুনিয়াছি যে— রাত্রিতে তাঁহার শরীরে কয়েকবার আগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তিনি এরূপ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমাদের বাড়ী কোনও

অপদেবতার ক্রীড়াভূমি। তিনি সেই রাত্রিতে কি একটি পুরশ্চরণ করিলেন, তাহা আমি জানি না। তিনি আমাকে মাতার কাছে শুইয়া থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন, এবং রাত্রিতে পুরস্ত্রী কেহ যেন একাকিনী গৃহের বাহিরে না যান নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। আমার নিদ্রা। মাতা বাহিরে গিয়াছেন। নিদ্রিত বলিয়া আমাকে, কি দাসীকে জাগান নাই। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জাগাইলেন। বলিলেন— তোমার বৈদ্য দাদা কি জন্য এত রাত্রিতে ছাদে গেলেন, দেখিয়া আইস ত?— ইনি তদানীন্তন চট্টগ্রামের সর্বপ্রধান বিখ্যাত চিকিৎসক। সমুদয় গৃহ পুড়িয়া যাইয়া কেবল মাটির কোঠা ঘর মাত্র ছিল। আমি যাইয়া দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই। বাহিরে একটি আচ্ছাদনের নীচে পুরশ্চরণ হইতে ছিল। আমি সেখানে যাইয়া বৈদ্য দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— আপনি কি এখন বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিলেন?— প্রশ্ন শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। মাতা অন্তঃসত্ত্বা। পুরী বাবাজী শুনিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। বলিলেন— ভয় নাই। মাতা যেন একাকিনী বাহিরে না যান।— আমি ফিরিয়া আসিলাম। মাতা পাছে ভয় পান বলিয়া বলিলাম— হ্যাঁ বৈদ্যদাদা আসিয়াছিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মাতা ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন। আমি পিতাকে সংবাদ দিতে গেলাম। পুরী বাবাজী ভীত হইলেন। তখন যজ্ঞ হইতেছিল। আমাকে অল্প ভস্ম দিলেন, এবং মাতাকে খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন। মাতা খাইলেন, এবং তাহার পর কই আর কোনও অসুখের কথা বলিলেন না। রাত্রিতে কি হইল আমি জানি না। পিতার কাছে পরদিন শুনিলাম যে, পুরী বাবাজী আমাদের বাড়ীর চতুঃসীমা পরিভ্রমণ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম কোণেতে বলিদানের পাঁঠাটি পুতিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আর আমাদের বাড়ীতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিবে না। তাহার পরে চল্লিশ বৎসর যাবৎ আমাদের কোনও ঘরের সংলগ্ন আত্মীয়দের ঘর দুইবার জ্বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমাদের নিজ বাড়ীর একটি তৃণও দগ্ধ হইয়াছিল না। কবিগুরু তোমার কথাই যথার্থ। স্বর্গে মর্ত্যে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা এখনও দর্শন শাস্ত্রে আয়ত্ত হয় নাই।

রসিকমোহনের দেখা সাধুর অলৌকিক ক্ষমতা

বহু বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রণেতা, মহা পণ্ডিত ডাঃ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ একবার এক সাধুর মেস্‌মেরাইজ করার অলৌকিক ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর দেখা সেই ঘটনাটি ১৯০৪ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখের "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা" নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখেছিলেন। মৃণালকান্তি ঘোষ তাঁর "পরলোকের কথা" গ্রন্থে বিদ্যাভূষণ মশায়ের সেই রচনাটি উদ্ধৃত করেছেন। আমরা 'পরলোকের কথা' গ্রন্থ থেকেই বিদ্যাভূষণ মশায়ের সেই লেখাটি এখানে উদ্ধৃত করছি। লেখাটি এই :

১৮৪০ সালের ২৭শে এপ্রিল অপরাহ্নে" কলিকাতা মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটস্থ ৪৯নং বাসায় আমরা মস্তিষ্ক শক্তি (Brain Power) ও মেস্‌মেরিজম্ সম্বন্ধে খুব ঘটা করিয়া আন্দোলন আলোচনা করিতেছিলাম। মেডিকেল কলেজের আমার প্রাচীন সতীর্থগণের মধ্যে পাঁচজন ব্যুৎপন্ন প্রবীণ ডাক্তারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই বাসায় আমাদের জনৈক ছাত্র-বন্ধু জ্বরবিকারে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। তাহাকে দেখিবার জন্য সেই সময় ডাঃ ভগবানচন্দ্র রুদ্র এম-ডি মহাশয় আসিলেন।

রোগী জ্বরে প্রলাপ বকিতেছিল। চক্ষু লাল, জ্বরের উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রি। রোগীর শুশ্রূষার যথারীতি ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, অন্য ঘরে আসিয়া, মেস্‌মেরাইজ দ্বারা এই জ্বরবিকার আরাম করা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে আমরা আলাপ-আলোচনা করিতেছিলাম। রুদ্র মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া আমরা সসম্ভ্রমে উঠিলাম এবং তাঁহার সহিত রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলাম। তিনি রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন ও ব্যবস্থাপত্র আমার হাতে দিলেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম— মহাশয়, এই ঔষধ বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে, কোন ফলোদয় হয় নাই। তবে মাত্রার কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। এইরূপ যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্যে যদি ফলের কোন তারতম্য হয় ত স্বতন্ত্র কথা।

তিনি বলিলেন— সে ধারণা আমার নাই, তবে আমার বিশ্বাস এইরূপ প্রলাপে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। বহু ব্যবহারেও যদি ফল না হইয়া থাকে, তবে এ ঔষধে কোন ফলের আশা নাই।

তথাপি ঐ ঔষধ আনাইয়া খাওয়ান হইল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। তখন রুদ্র মহাশয়কে বলিলাম— ইহাতে ফল হইতেছে না, আর কোনো উপায় থাকে ত বলুন।

তিনি বলিলেন— আর কি উপায়?

এই সময় সহরে মেস্‌মেরাইজমের খুব একটা হুজুগ পড়িয়া গিয়াছিল। মেডিকেল কলেজেও মধ্যে মধ্যে এই বিষয়ের আলোচনা হইত। আমি ডাঃ রুদ্রকে বলিলাম,— আপনি মেস্‌মেরাইজ করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে পারেন কি?

তিনি বলিলেন— উহাতে আমার বিশ্বাস বড় কম। তবে স্নায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট লোকদিগকে স্বীয় বাসনার আয়ত্তে আনিয়া অনেক প্রকার কার্য করা যাইতে পারে বটে ; কিন্তু এই রোগীকে মেস্‌মেরাইজের দ্বারা বশে আনা অসম্ভব। তোমরা উহার মাথায় বরফের ব্যাগ (ice bag) প্রয়োগ কর গিয়ে।

আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম। এইরূপে বার ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কিন্তু কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

সুবিধা পাইলেই আমি সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ঘাটে বেড়াইতে যাইতাম। সেদিনও গেলাম। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে যাইয়া দেখি, সেখানে এক সন্ন্যাসীঠাকুর বসিয়া আছেন। তাঁহার আকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে সদাশয় বলিয়া বোধ হইল। আমি তাঁহার নিকটবর্তী হইলাম। আমাকে আলাপ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া তিনি স্নেহভরে বসিতে বলিলেন। আমি হিন্দীভাষা ভাল বুঝিতাম না। সুখের মধ্যে তিনি ইংরাজিতে আলাপ করিতে লাগিলেন, আমার বুঝিবার সুবিধা হইল। আমি ডাক্তারী জানি শুনিয়া তিনি বলিলেন— চিকিৎসা অনেক প্রকার আছে ; কিন্তু যোগ বিদ্যার চিকিৎসাই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

আমি। উহা কথার কথা, কাজে প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস হয় না।

সন্ন্যাসী। (ঈষৎ হাসিয়া) আচ্ছা রোগী পাইলে আমাকে দেখাইও ; আমি পরীক্ষা দিয়া তোমার নিকট ভাল সার্টিফিকেট লইব।

আমি। আমার হাতে রোগী আছে, আপনি চলুন।

সন্ন্যাসী। এখন যাইব না, আমার কাজ আছে। তিন ঘণ্টা পরে যাইব, ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া যাও।

ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম, এরূপ সুপণ্ডিত সদাশয় ব্যক্তি হইয়াও বুজরুকী ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ঠিকানা ত লিখিয়া রাখিলেন ; যাবেন যে, তা মা গঙ্গাই জানেন। ফলকথা, আমার তখন বেশ ধারণা হইল সে, সন্ন্যাসীঠাকুর আমাকে ফাঁকি দিয়া বিদায় করিলেন।

বাসায় আসিয়া দেখি রোগী ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। কখনও শয্যা হইতে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, কখনও জোর করিয়া উঠিয়া কাপড়-চোপড় দিয়া পুঁটুলী বাঁধিতেছে আর অনবরত প্রলাপ বকিতেছে। ইহা দেখিয়া সকলেরই মনে হইল রোগীর অবস্থা সুবিধাজনক নহে। প্রকৃতই তখন রোগীর ঘোর বিকার উপস্থিত। মাথায় বরফ দিয়া কোন ফল না হইলেও, অন্য কোন প্রক্রিয়ার বন্দোবস্ত না থাকায়, বরফই দেওয়া হইতেছিল। এইরূপ তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। আমার তখন মনে হইতে লাগিল, গঙ্গার তীরে বসিয়া এইরূপ মিথ্যাকথা বলা কি সন্ন্যাসীর মত ধার্মিক লোকের কাজ।

এই সময় সহসা সদর-দরজায় 'হর হর বম্‌ বম্‌ শ্রীমহাদেব শম্ভো' ধ্বনি শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম। দরজা খুলিয়া দেখি সম্মুখে সন্ন্যাসীঠাকুর দাঁড়াইয়া। তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া তখনই উপরে রোগীর ঘরে লইয়া গেলাম। সন্ন্যাসীঠাকুর কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া রোগীর শয্যায় ও তাহার গায়ে ছিটাইয়া দিলেন। তাহার পর রোগীর সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া তাহার চক্ষুর দিকে একদৃষ্টে চাহিলেন। রোগী মুখ বাঁকা করিল। সন্ন্যাসী হাত দিয়া তাহার মুখখানি সোজা করিয়া, আবার তাহার চক্ষুপানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিলেন। সন্ন্যাসীর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া আমার বোধ হইল, উহা যেন রোগীর বহির্দৃষ্টি ভেদ করিয়া তাহার মস্তিষ্কের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিতেছে। তখন বোধ হইল, রোগী যেন তাহার সেই জবাকুসুম-সঙ্কাশ আরক্ত-লোচনে সন্ন্যাসীর দিকে স্তম্ভিত ও স্থির ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। ঠিক পাঁচ মিনিটকাল তাহার চক্ষুর স্পন্দন হইল না। অবশেষে চক্ষুর কোণে জল আসিয়া চক্ষুদ্বয় ছলছল হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসীঠাকুর স্নিগ্ধ অথচ তীক্ষ্ণ ও স্থির দৃষ্টিতে সমভাবে রোগীর প্রতি চাহিয়াই রহিলেন। রোগীর চক্ষু ধীরে ধীরে ছোট হইয়া আসিল ও ক্রমে মুদিত হইল। তখন সন্ন্যাসী মন্ত্রপাঠ করিয়া রোগীকে ঝাড়িতে লাগিলেন। রোগী যেন গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া রহিল। সন্ন্যাসী বলিলেন— বারটার পর রোগী জাগিবে ও খাইতে চাহিবে, তখন দুধ খাইতে দিবে।— শেষে হাসিয়া বলিলেন— আর আগামী কল্য আমাকে সার্টিফিকেট দিও।— এই কথা বলিয়া, আর তিলার্ধকাল অপেক্ষা না করিয়া, তিনি চলিয়া গেলেন।

আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া ১২টা বাজিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ঘরে কোন গোলমাল কি শব্দ না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া, আমরা চারিজন বন্ধু রোগীর কাছে বসিয়া রহিলাম। রাত্রি ১১টায় সময় হইতে রোগীর দেহ হইতে দরদর ধারায় ঘর্ম নির্গত হইতে লাগিল। ১২টা বাজিবার পরেই রোগী চেতনালাভ করিল, এবং ক্ষীণস্বরে বলিল— বড় ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও।

আমরা দেখিলাম, রোগীর চক্ষুতে রক্তরেখার লেশমাত্র নাই। তাহার দেহের তাপ ৯৭ ডিগ্রিরও কম, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক, নাড়ী ধীর অথচ সমগতি। রোগীকে দুধ

খাইতে দিলাম। প্রদীপের আলো ক্ষীণ করা হইল। আমাদের মধ্যে দুইজন শয়ন করিলেন। রোগী বলিল— আমি বেশ আছি, আপনারাও শয়ন করুন।— আমার তখন মনে হইতেছিল, যদি বেশী ঘর্ম হইয়া দেহের তাপ আরও কমিয়া যায়, তখন কি হইবে? কাজেই আমি শুইলাম না। কিন্তু ১২টার পর রোগীর আর ঘাম হইল না। এক ঘণ্টা পরে রোগীর নাড়ী ও হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলাম, আশঙ্কার আর কোন কারণ নাই, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন সকাল ৭টার সময় উঠিয়া রোগীর ঘরে গিয়া দেখি তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, বেশ ভাল আছে, সহসা জ্বর-বিচ্ছেদ হওয়ায় কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। তখন কুইনাইন দেওয়া হইবে কি না, এই প্রশ্ন উঠিল। শেষে সাব্যস্ত হইল, কুইনাইন বা অপর কোন ঔষধ দেওয়া হইবে না।

তখন সন্ন্যাসীঠাকুরকে সার্টিফিকেট (অর্থাৎ সাধুবাদ) দিবার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে গেলাম ; কিন্তু সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। এমন কি, তাঁহার কোন চিহ্নও সেখানে নাই। তখন দুঃখিত মনে বাসায় ফিরিলাম এবং রোগীর সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলাম।

রোগী বলিল, কি প্রকারে সে রোগমুক্ত হইল, তাহার বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। তবে রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতেছিল— যেন মহাদেব বিছানার কাছে বসিয়া ঢুলঢুলু নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন, আর ধীরে ধীরে তাহার দেহ নিদ্রায় অবশ হইয়া আসিতেছে। ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু রোগী বলিতে পারিল না।

রোগী ক্রমে বেশ সুস্থ ও সবল হইল, তাহার কোন ঔষধের প্রয়োজন হইল না। কিন্তু আমাদের মনে একটা খটকা থাকিয়া গেল। আমরা ভাবিলাম, চোখের দিকে চাহিয়া এইরূপ ভীষণ জ্বরবিকার আরোগ্য করা হইল, ইহা কি প্রকারের শক্তি? ইহা কি দৈবীশক্তি কিংবা মানুষী শক্তি? মানুষে যে এই প্রকারের দৈবীশক্তি দেখাইতে পারে, তাহা কিন্তু মানিতাম না। আমরা মেস্‌মেরিজমের কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু ডা. রুদ্র বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এই রোগীকে মেস্‌মেরাইজ করা আদৌ সম্ভবপর হইতে পারে না· , কারণ মেস্‌মেরাইজ করিতে হইলে রোগীর স্বাভাবিক জ্ঞান (natural consciousness) থাকা আবশ্যক। বিকারগ্রস্ত রোগীর সেরূপ জ্ঞান থাকে না; কাজেই তাহাকে আয়ত্তাধীনে আনা যায় না। — রুদ্র মহাশয়কে শেষে সকল কথা জানাইলাম। তিনি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, প্রকৃত কারণ স্থির করিতে পারিলেন না।

প্রকৃতই রোগীর বিকার অতি ঘোরতর হইয়াছিল। বাহ্যজগতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। সে তখন আপন মনে কথা বলিতেছিল। কেহ ডাকিলে সে কথার সাড়া দিত না, কেহ তাকাইলে তাহার দিকে তাকাইত না। সুতরাং তাহাকে মেস্‌মেরাইজ করিতে হইলে, তাহার মস্তিষ্ক-বৃত্তিকে যে প্রণালীতে স্বীয় আয়ত্তে আনিতে হয়, এস্থলে তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। দৃষ্টির একাগ্রতা সাধন দ্বারা

স্নায়ু-প্রণালী অবশীভূত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষকে আপন আয়ত্তাধীনে আনা যাইতে পারে। কিন্তু যে রোগী একেবারেই বাহ্যজ্ঞানহীন, তাহার দৃষ্টির একাগ্রতা সাধনই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

ইতঃপূর্বে আমি ফিজিয়লজীর আলোক লইয়া নিম্নলিখিত প্রকারে মেস্‌মেরিজম বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। যথা,— যিনি মেস্‌মেরাইজ করেন, তিনি তদুপযুক্ত ব্যক্তিকে কোন উজ্জ্বল বা অপর কোন পদার্থের প্রতি, অথবা তাঁহার নিজের চক্ষুর প্রতি, একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে আদেশ করেন। এই অবস্থায় কাহারও কাহারও দৃষ্টি অল্পক্ষণ মধ্যে অস্পষ্ট বা তিমিরাবৃতের ন্যায় হইয়া পড়ে, দেহ অবসন্ন হইয়া আসে, চক্ষুর পাতা ক্রমে জুড়িয়া যায়, হাই উঠিতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাস ঘনঘন বহিতে থাকে, এবং চেতনা শক্তি ক্রমে লোপ পাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

এই সকল লক্ষণ স্নায়ুবিক দৌর্বল্যের পরিচায়ক, এবং ইহার ফলে এই ব্যক্তির মনোবৃত্তি বা বাসনা, যে ব্যক্তি মেস্‌মেরাইজ করেন, তাঁহার বাসনার সম্পূর্ণ অধীনে হইয়া পড়ে। তিনি তখন উহাকে যেরূপভাবে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করেন, সে সেই ভাবেই পরিচালিত হয়। তিনি যদি বলেন— তুমি অন্ধ হইয়াছ, তবে সে প্রকৃতই অন্ধ হইয়াছে বলিয়া তাহার দৃঢ় ধারণা হয় এবং সে ঠিক অন্ধের ন্যায় আচরণ করে। তিনি যদি বলেন— তুমি বোবা, তবে সে ঠিক বোবার ন্যায় শব্দ করে। এই প্রকারে বশীভূত ব্যক্তিদ্বারা বশকারী ব্যক্তি যথেচ্ছারূপে বিবিধ কার্য করাইতে পারেন। এমন কি, তাহার ইন্দ্রিয়শক্তির উপরেও যথেচ্ছা অত্যাচার করা যাইতে পারে। যদি বশীভূত ব্যক্তির হাতে রশুন দিয়া বলা যায় যে, ইহা গোলাপফুল, তাহা হইলে রশুনের ঘ্রাণ লইয়া সে বলিবে, গোলাপফুলের সুমধুর গন্ধ পাইতেছে।

এই সকল ঘটনা দেখিয়া আমার মনে হইত, সরল ও শান্ত প্রকৃতির লোক-বিশেষের স্নায়ু-প্রণালীর উপর ভীষণ-অত্যাচার করিয়া অভিসন্ধিশীল বশীকরণ-বিদ্যাবিদ্‌গণ এই প্রকার বুজরুকী দেখাইয়া থাকেন। আমি ফিজিয়লজীর nervous systemএর সূক্ষ্মতত্ত্বের কথা তুলিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতাম।... কিন্তু সন্ন্যাসীঠাকুর এই ভীষণ বিকারগ্রস্ত রোগীর বিকৃত স্নায়ুর উপর কি কৌশলে এই অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, তাহা আমি আদৌ বুঝিতে পারিলাম না। ম্যানচেষ্টারের ডাঃ ব্রেড যে অবস্থাকে নিউরো-হিপ্‌নোটিজম্ (Neuro-hypnotism) বলেন এবং সাধারণ লোকে যাহাকে হিপ্‌নোটিজম্ (hypnotism) বলে, এই প্রকার রোগীর পক্ষে সে অবস্থা একেবারে অসম্ভব। যাঁহারা স্নায়ুবিকারের সংপ্রাপ্তি বা Pathology জানেন, তাঁহারা কিছুতেই মনে করিতে পারিবেন না যে, সন্ন্যাসীঠাকুরের এই প্রক্রিয়া নিউরো-হিপ্‌নোটিজম্ মাত্র। সুতরাং আমি জড়ীয়-বিজ্ঞানে যে প্রকারে মেস্‌মেরিজমের ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম, এস্থলে তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল।

কিরণচাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা

কিরণচাঁদ দরবেশ শুধু সন্ন্যাসীই ছিলেন না, তিনি একজন নামকরা কবিও ছিলেন। তাঁর রচিত 'মন্দির', 'রেবা', 'মন্দাকিনী', 'সুষমা' প্রভৃতি কাব্যগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর কবি-প্রতিভার জন্য কাশীর পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক "কাব্যরত্ন" উপাধিতেও ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি 'মন্দির' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও বহু বৎসর সম্পাদনা করেছিলেন।

দরবেশজীর গৃহস্থ আশ্রমের নাম ছিল কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ফরিদপুর জেলায় মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত খালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ শিষ্যদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

এই সাধক কবি তাঁর গুরুর জীবনে যেমন অনেক অলৌকিক ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন, তেমনি তিনি নিজেও কিছু কিছু অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর নিজের অলৌকিক শক্তির কথা বলবার আগে, তাঁর লেখা একটি চিঠি থেকে, তাঁর গুরুর অলৌকিক শক্তির সম্বন্ধে কিছু বলছি :

দরবেশজী তখন তাঁর গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং বহু গুরুভাইএর সহিত পুরীতে বাস করছেন। সেই সময় তিনি পুরী থেকে তাঁর স্বগ্রাম নিবাসী আর এক গুরুভাই রেবতীকান্ত রায় চৌধুরীকে গোঁসাইজীর অলৌকিক শক্তির কথা উল্লেখ করে এক চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিটি অনেক বছর পরে কিভাবে শ্রীযুক্তা কৃষ্ণকুমারী গুপ্তা নামক জনৈকা ভদ্রমহিলার হাতে যায়। কৃষ্ণকুমারী দেবী চিঠিটি পেয়ে তার সঙ্গে একটু ভূমিকা লিখে 'একখানা পুরাতন চিঠি' নাম দিয়ে প্রবন্ধ আকারে চিঠিটি দরবেশজীর কাছে তাঁরই সম্পাদিত 'মন্দির' পত্রিকায় ছাপাবার জন্য পাঠিয়ে দেন। দরবেশজী কৃষ্ণকুমারী দেবীর প্রেরিত ঐ প্রবন্ধটি বা ভূমিকাসহ পত্রটি ১৩৫১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা মন্দিরে প্রকাশ করেন। সম্পাদক দরবেশজী চিঠিটি ছাপবার সময় চিঠির নীচে নিজেরও কিছু মন্তব্য লিখে দিয়েছিলেন। এখানে আমরা মন্দির পত্রিকা থেকে কৃষ্ণকুমারী দেবীর ভূমিকা এবং দরবেশজীর মন্তব্য সহ সেই চিঠিটি উদ্ধৃত করছি :

একখানা পুরাতন চিঠি

শ্রীকৃষ্ণ কুমারী গুপ্তা।

৪৬ বৎসর পূর্বে 'মন্দির' সম্পাদকের স্বহস্তে লিখিত একখানি চিঠি দৈবক্রমে আমার হস্তগত হইয়াছে। চিঠির তারিখ— পুরী, নীলমণি বর্মণের বাড়ী, ১৩০৫ সালের ২রা আষাঢ়। ১৩০৫ সালের পর ৪১৩ একটি সংখ্যা লিখিত আছে, উহা যে কি নির্দেশক তাহা বুঝিতে পারি নাই। তখন গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে দরবেশ মহাশয় পুরীতে বাস করিতে ছিলেন, এবং তথা হইতেই খালিয়া (ফরিদপুর) নিবাসী তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বর্গীয় রেবতীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়কে এই চিঠি লিখিয়াছিলেন। সত্যতার জন্য মূল চিঠি এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আশা করি সম্পাদক মহাশয় এই চিঠিখানি আমাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। .:.গোঁসাইজীর জীবনের এমন একটি ঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে, যাহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত গোস্বামী প্রভুর কোনও জীবনীতে আমরা পাই নাই। চিঠিখানি এই :

পুরী
নীলমণি বর্মণের বাড়ী
বড়দাণ্ড
২রা আষাঢ় ।। ১৩০৫।৪১৩

শ্রীচরণেষু—

দাদা, আমি নির্বিঘ্নে আসিয়া এখানে পৌঁছিয়াছি। আসিবার সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় একটু দুঃখিত হইয়াছিলাম।

এখানে আসিয়া প্রাণে যে সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা চিঠিতে লিখিয়া জানান অসম্ভব। গোঁসাইর শরীর এখন খুব ভাল আছে। তিনি রোজ প্রাতে প্রায় দেড় মাইল হাঁটিয়া গিয়া সমুদ্র স্নান করেন ; আবার হাঁটিয়া আসেন। আমরাও তাঁহার সঙ্গে গিয়া সমুদ্র স্নান করিয়া থাকি। সমুদ্র স্নান করিতে করিতে আমাদের এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, আমরা সমুদ্রের অনেকটা দূর ভাসিয়া যাই এবং রোজ প্রায় ৫০।৬০টা ঢেউ লইয়া থাকি। ইহাতে আমাদের কোন ভয় কি কষ্ট হয় না। সমস্ত লোক দেখিয়া আশ্চর্য হয়। এই দুই চার দিনে আমারও বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কোনই কষ্ট হয় না।

আমাদের এখানে রান্না হয় না। রোজ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে মহাপ্রসাদ আসিয়া থাকে। গোঁসাই মহাপ্রসাদ ব্যতীত কিছুই আহার করেন না। প্রাতে ৮।৯টার সময়ে পাখাল প্রসাদ অর্থাৎ জলে দেওয়া পান্তা প্রসাদ এবং বেলা ৩।৪টার সময়ে মন্দির হইতে প্রসাদ আসিয়া থাকে। মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অতি আশ্চর্যরূপে অনুভব করিয়াছি। আপনি জানেন, উচ্ছিষ্ট পালনের আমাদের কত কড়াকড়ি নিয়ম। কিন্তু এখানে সে নিয়ম কিছুই নাই। আমরা ব্রাহ্মণ কায়স্থ একত্রে এক থালায় বসিয়া খাই। ইহাতে কারও মনে একটুকুও দ্বিধা ভাব আসে না। ইহাই অতি আশ্চর্যের বিষয়।

আমরা এখানে অনেক গুরুভাই আছি। বড় বড় তিনটি বাড়ীতে আর স্থান কুলায়

না। এতদ্ভিন্ন রোজ প্রায় এক হাজার কাঙালী এখানে প্রসাদ পাইয়া থাকে। অজস্র টাকা খরচ হইতেছে, আবার চারিদিক হইতে অজস্র টাকা আসিতেছে। এই দেখি হাতে একটি পয়সাও নাই ; সমস্ত বিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, পর মুহূর্তেই যেন কোথা হইতে শত শত টাকা আসিয়া জুটিতেছে। এমন ভূতের ব্যাপার আমি কখনও দেখি নাই। সমস্তই গোঁসাইর খেলা।

গত স্নানযাত্রার সময়ে এক অদ্ভুত ও ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। গোঁসাই শ্রীমন্দিরে স্নানযাত্রা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানকার পাণ্ডারা 'টাকা না পাইলে ঢুকিতে দিব না' বলিয়া প্রথমতঃ গোঁসাই ও তাঁহার শিষ্যদের ঢুকিতে দেয় নাই। ঢুকিতে না পাইয়া গোঁসাই এক ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত শিষ্যেরা অত্যন্ত ক্রোধিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ঢুকিতে না দেওয়ায় গোঁসাই সকলকে লইয়া ফিরিয়া আসেন। যে মুহূর্তে গোঁসাই চলিয়া আসিলেন, সেই মুহূর্ত হইতেই শ্রীজগন্নাথদেবের ভয়ানক কম্প হইতে লাগিল।— এই কম্প সমস্ত যাত্রীই স্বচক্ষে দেখিয়াছে। ঠাকুরকে কাঁপিতে দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডারা ভীত হইয়া আসিয়া গোঁসাইর নিকট কাঁদিয়া পড়িল। সকলে বলিল— 'গোঁসাই, আপনাকে অপমান করার জন্যই ঠাকুরের কম্প হইতেছে, আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি মন্দিরে না গেলে আর আমাদের রক্ষা নাই।' গোঁসাই তাহাদের কাতরতা দেখিয়া মন্দিরে গেলেন; তখন শ্রীজগন্নাথদেবের কম্প বন্ধ হইল। কিন্তু ইহাতেও পাণ্ডাদের শাস্তি শেষ হইল না। তৎপরদিন হইতে পাণ্ডাদের মধ্যে পরস্পরের খুব বিবাদ হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং একদিন জগন্নাথের পাক্‌শালায় অগ্নি লাগিয়াছিল। ইহাতেও বেচারাদের রক্ষা নাই। তৎপরদিন, যে পাণ্ডা গোঁসাইকে ঢুকিতে দেয় নাই, তাহার বাড়ীতে কলেরা হইয়া একদিনে তাহার তিনটি ছেলে, স্ত্রী, কন্যা, ভাই ইত্যাদিতে ৮জন মারা গেল। তখন সেই পাণ্ডা অতি কাতর হইয়া শ্রীমন্দিরে হত্যা দিয়াছিল। হত্যা দেওয়ায় শ্রীজগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ হইল। পাণ্ডা স্বপ্নে দেখিল, ঠাকুর আতি রুদ্রমূর্তিতে আসিয়া বলিতেছেন, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আমার দ্বিতীয় কলেবর, তাঁহাকে অপমান করায় আমাকে অপমান করা হইয়াছে। তাহাতে ও আমাতে কোন ভেদ নাই, আমি তোদের সর্বনাশ করিব। এখন পর্যন্ত কিছুই করি নাই। ক্রমে ক্রমে আমি সমস্ত পাণ্ডাদিগকে ধ্বংস করিব।' পাণ্ডা খুব কাঁদিয়া পড়ায় শ্রীজগন্নাথদেব একটু শান্ত হইয়া বলিলেন— 'যদি গোঁসাই তোদের ক্ষমা করে তবেই রক্ষা। নতুবা তোদের আর নিস্তার নাই।' পাণ্ডার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে সকলকে এই কথা বলায় সমস্ত পাণ্ডা একত্র হইয়া আসিয়া গোঁসাইকে ধরিয়া পড়িল। গোঁসাই বলিলেন— 'আমি তোমাদের উপর একটুকুও রাগি নাই কিম্বা অপমান বোধ করি নাই। আমার নিকটে তোমাদের কোনই দোষ নাই।' ইহার পর হইতে রীতিমত আবার সেবা চলিতেছে। ঘটনাটি মোটামুটি লিখিলাম, ইহার ভিতর আরও অনেক কথা আছে। চিঠিতে সব

লেখা অসম্ভব। দেখা হইলে সমস্ত বলিব। গোঁসাইর লীলা খেলা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। কিন্তু এমন পাজি মন যে, ইহাতেও খাঁটি বিশ্বাস আসিতেছে না। আমাকে আপনি আশীর্বাদ করিবেন।

আপনি এখন কেমন আছেন? আপনার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিস্তারিত লিখিয়া জানাইবেন। আপনার মাতাকে ও খুড়ীকে আমার প্রণাম জানাইবেন।

শ্রীযুত জ্যোতিষ রায়চৌধুরী মহাশয় কেমন আছেন? তাঁহাকে আমার চিঠি দেখাইয়া প্রণাম জানাইবেন। আমি তাঁহার আশীর্বাদ ভিখারী।

আর অধিক কি লিখিব? এখানকার মঙ্গল। আপনাদের কুশল প্রার্থনীয়। ইতি—

দীনদাস
কিরণচন্দ্র

আমরা চিঠিখানি দেখিয়া অবাক হইয়াছি। বহু পুরাতন স্মৃতি এই চিঠির মধ্য দিয়া আমার অন্তরে জাগরিত হইয়াছে। শরীর নিতান্তই অপটু, নহিলে এ সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু লিখিবার ছিল। চিঠিতে ৪১৩ সংখ্যাটি শ্রীচৈতন্যাব্দ। তখন আমি প্রত্যেক চিঠিতে বাঙ্গলা সনের পাসে শ্রীচৈতন্যাব্দ সনটা লিখিতাম।— সম্পাদক।

১৩৪৮ সালে কাশীতে যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শতবার্ষিকী উৎসব হয়, তাতে স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ প্রমুখ অনেকেই বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দরবেশজীও বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাঁর গুরুর সম্বন্ধে বলেছিলেন— "বিজয়কৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর ছেলেমেয়েও হয়েছিল। যখন ছেলেমেয়ে হয়েছে, তখন আপনারা বলবেন যে, তাঁর 'কাম' ছিল, কিন্তু আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে, শেষ জীবনে তাঁর লিঙ্গ ছিল না, একটি যোনিবৎ চিহ্ন মাত্র ছিল। এ আমার নিজের চোখে দেখা।

জীবনের শেষ ১১ বৎসর তিনি ঘুমান নাই। আপনারা কখনও শুনেছেন যে, যে লোকটা খায়, হাগে, বেড়ায় সে ঘুমায় না। গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন, 'যাঁকে পেয়েছি, তাঁকে ছেড়ে ঘুমোতে ইচ্ছা হয় না'।" মন্দির—অগ্রহায়ণ,

এবার দরবেশজীর নিজের অলৌকিক শক্তির দুটি কাহিনী বলছি—

(১) পুরুলিয়ার রামচন্দ্রপুরে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী, দরবেশজীর অন্যতম শিষ্য। অসীমানন্দজী তখনও দরবেশজীর নিকট দীক্ষা নেন নি, এমন কি তাঁকে চোখেও দেখেন নি। শুধু বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর কবিতা পড়েছেন মাত্র। অসীমানন্দজী তখন গৃহী এবং একজন বড় সমাজসেবী। সেই সময় একদিন পুরুলিয়ায় মহাত্মা নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট তিনি দরবেশজীর কথা শুনেন। মহাত্মা নিবারণচন্দ্র সেদিন কথা প্রসঙ্গে অসীমানন্দজীর কাছে দরবেশজীর এক অলৌকিক শক্তিরও উল্লেখ করেছিলেন। অসীমানন্দজী মহাত্মা নিবারণচন্দ্রের

সেদিনের কথা তাঁর সম্পাদিত মন্দির পত্রিকায় (দরবেশজীর দেহত্যাগের পর অসীমানন্দজী মন্দিরের সম্পাদক হন) ১৩৫৬ সালের আশ্বিন সংখ্যায় "দরবেশজীর প্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধে এইরূপ লিখেছেন :

পরমপূজ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশজী মহারাজের সহিত তখনও প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় হয় নাই। বর্ধমানের কর্মক্ষেত্র ছাড়িয়া সবে মানভূমে আসিয়াছি। পুরুলিয়ার মহাত্মা নিবারণচন্দ্রের সহিত কবি-প্রসঙ্গ আলোচনায় তিনি যাহা বলিয়াছিলেন— তাহাই এই নিবন্ধে লিখিত হইল— সম্পাদক।

মহাত্মা বলিলেন :

তোমাকে আজ একজন সাধক কবির কথা বলিব। যাঁহার সাধন মার্গের অনুভূতি এই মন্দির কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া তিনি মন্দির কাব্যের রচনায় স্তর বিভাগ বিশ্লেষণ করিয়া সাধক জীবনে কাব্য হিসাবে এবং যাত্রাপথে অনুজ্ঞা হিসাবে ইহা যে কত উপযোগী তাহা বুঝাইয়া বলিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির মধ্যে বিশ্বপ্রেমের যে প্লাবন রহিয়াছে— মন্দিরে তাহাই নিজ অনুভূতির প্রকাশরূপ সাধনার স্তর বিভাগের ভিতর দিয়া একটি জীবন কেমনভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে এবং মুক্তির আনন্দে বিভোর হইয়া বিশ্বকে আপনার আত্মায় এবং আপনাকে বিশ্বের আত্মায় বিলীন করিয়া দিতে পারে, মন্দির কাব্যে তাহাই সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। মন্দির কাব্য যদি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া পাশ্চাত্যে দেশে পাঠান হইত, তবে ইহা যথেষ্ঠ সমাদর লাভ করিত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— তিনি কোথায় থাকেন? বিভিন্ন পত্রিকায় ইহার অনেক কবিতা পড়িয়াছি।

শুনিয়া তিনি বলিলেন— 'দরবেশ, মুসলমান নহে। ইহার ঠিক নাম কিরণচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। বংশানুক্রমে প্রতাপান্বিত মস্ত জমিদার। গুরুর আদেশে একদিনে বিরাট সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। ইনি আমার বাল্যবন্ধু। বরিশালে বি. এম. ; এ একসঙ্গে পড়িতাম। আমি, প্রেমানন্দ আর দরবেশ তিনজনে সংকল্প করিলাম সন্ন্যাসী হইব। আমাদের একটি Poor fund ছিল। আমরা গ্রামে গ্রামে চাউল পয়সা সংগ্রহ করিয়া আনিতাম এবং তাহা দিয়া গরীব ছেলেদের সাহায্য করিতাম। তিনজনের এক সংকল্প থাকিলেও আমাকে সংসারী হইতে হইল। দরবেশ ও প্রেমানন্দ উভয়ের মধ্যে দরবেশ গৃহী হইয়া পরে সন্ন্যাসী হইলেন। প্রেমানন্দ আর সংসার করিলেন না। আমার অবস্থা তো দেখিতেছ। ভারতের মুক্তি সাধনাই আমার ব্রত। গোস্বামী প্রভুর নিকট লব্ধ সাধন শক্তিতে ও পূর্ব জন্মের অসাধারণ তপস্যার ফলে দরবেশ আজ ঋষি পর্যায়ভুক্ত। তাঁহার অসাধারণ শক্তি। একবার কাশীতে আমরা দুইজনে কোন আশ্রমে গিয়াছিলাম। দরবেশের জলতৃষ্ণা পাওয়ায় তিনি এক গ্লাস জল চাহিলেন।

আশ্রমের সাধুর নির্দেশে একব্যক্তি জল আনিয়া দিল। দরবেশ জল হাতে লইয়া দেখেন, জল ফিনাইল হইয়া গিয়াছে। তিনি হাসিয়া সাধুকে বলিলেন— আমি জল চাহিলাম, আপনি দুধ দিলেন।— সাধু নিজের শক্তি দেখাইবার জন্য জলকে ফিনাইল করিয়াছিলেন। দরবেশ তাহার উত্তরে ফিনাইলকে দুধে পরিবর্তিত করিয়া গ্লাসটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন— এখানে সাধুর আসা উচিত নহে— বলিয়া স্থানত্যাগ করিলেন।

সাধুকে বলিতে শোনা গেল, 'সিংহের বাচ্ছা'। এইরূপ আরও অনেক ঘটনা আমি জানি। তিনি যেমন কবি, তেমনি অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ। এমন আত্মস্থ হইয়া অধ্যয়ন করিতে আমি কাহাকেও দেখি নাই। এত শক্তি সত্ত্বেও একটি অতি সাধারণ ভদ্রলোক ছাড়া কিছু বুঝিবার উপায় নাই। পুরুলিয়াতে তিনি যখন আসিয়াছিলেন— তখন এখানে অনেকেই তাঁহাকে দেখিয়াছে। তাঁহার অন্তরটি যেমন সরস সুন্দর ও কোমল, বাহিরের গাম্ভীর্য এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তেমনি ভয়াল। কঠিন ও কোমলের, দৃঢ়তা ও সহানুভূতির, শক্তির ও বিনয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য এবং নিরহঙ্কারিতার এমন অপূর্ব সমাবেশ বড় দেখা যায় না। যদি পার, তাঁর সহিত দেখা করিও। তিনি তোমাকে যথেষ্ট শক্তি ও সম্পদ দান করিতে পারিবেন। আমার মনে হয়, তাঁহার নিকটেই তোমার ইপ্সিত লাভ হইবে।'

কে জানিত তাঁহার সেই ভবিষ্যৎ বাণী দীর্ঘকাল পরে এমন সুন্দর সাফল্য লইয়া আমার জীবনে কৃতকার্য করিবে। মহাত্মা নিবারণচন্দ্রের পরলোকগমনের পর কয়েক বৎসর পরে, আমি যখন দরবেশজী মহারাজের কৃপালাভ করিলাম, কথা প্রসঙ্গে মহাত্মা নিবারণ চন্দ্রের কথা তাঁহাকে বলিলে, তিনি বলিলেন— 'নিবারণ কয়দিনের জন্য গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করিলেও এমন আদর্শ মানুষ দেখা যায় না। এই প্রকৃত সন্ন্যাসী।'

আজ দরবেশজী মহারাজের তিরোভাব তিথিতে পুরুলিয়ায় বসিয়া এই দুইটি সন্ন্যাসীর কথাই মনে হইতেছে। আর এই বলিয়া নিজেকে ধন্য বোধ করিতেছি যে, এই দুই মহাপুরুষেরই চরণপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভের সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল।

(২) সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান কাঁটালপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি বাস করেন। ইনি সুপণ্ডিত এবং একজন সাহিত্যসেবী। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইনি বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ে, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। ইনি দরবেশজীর একজন শিষ্য। দরবেশজীর নিকট ইন্দুবাবুর সস্ত্রীক দীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারটির মধ্যেই দরবেশজীর একটি অলৌকিক শক্তির পরিচয় রয়েছে। কাহিনীটি এই :

ইন্দুবাবু তখন লাহোরে কণ্ট্রোলার অব্ মিলিটারী পেন্সন্স অফিসে কাজ করেন এবং মেসে থাকেন। একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন— তিনি যেন একাকী একটি

নৌকায় চড়ে এক অজ্ঞাত নদীর উপর দিয়ে কোথায় চলেছেন। অনেক দূর গিয়ে নৌকাটি নদীর বিশাল এক চড়ায় আট্‌কে গেল। ইন্দুবাবু নৌকাকে চড়া থেকে জলে নামবার জন্য বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই আর নামাতে পারলেন না। তখন তিনি মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন।

এমন সময় ইন্দুবাবু দেখতে পেলেন, তিনজন লোক, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, তাঁর পুত্র যোগজীবন এবং আর একজন, ঐ নদীর চড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁরা তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন।

ইন্দুবাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনীতে গোঁসাইজী ও তাঁর পুত্র যোগজীবনের ফটো দেখেছিলেন। তাই এঁদেরই শুধু চিনতে পেরেছিলেন।

ইন্দুবাবুর অবস্থা দেখে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর সঙ্গী তৃতীয় ব্যক্তিকে বললেন— দরবেশ, ওর নৌকাটি ঠেলে জলে নামিয়ে দাও।

বিজয়কৃষ্ণ এইকথা বলায় দরবেশজী তখন নৌকাটি ঠেলে জলে নামিয়ে দিলেন।

নৌকা জলে নামলে ইন্দুবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ঐ সঙ্গে সঙ্গে ইন্দবাবুর ঘুমও ভেঙ্গে গেল।

ইন্দুবাবু সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠে বসে ভাবতে লাগলেন— তাইত, এরূপ স্বপ্ন কেন দেখলাম।

পরদিন সকালেই ইন্দুবাবু তাঁর বন্ধু লাহোরের ডি. এ. ভি. কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক মহেন্দ্রকুমার সরকারকে তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন। মহেন্দ্রবাবু ইন্দুবাবুর স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে বললেন— আমার মনে হচ্ছে, আপনার এবার দীক্ষা নেবার সময় হয়েছে, তাই ঐরূপ স্বপ্ন দেখলেন। যাই হোক্, স্বপ্নটি কিন্তু খুবই ইঙ্গিত মূলক।

এই স্বপ্ন দর্শনের কিছুদিন পরে ইন্দুবাবু একবার সস্ত্রীক কাশী যান। কাশী গিয়ে ইন্দুবাবু একদিন স্ত্রীকে বাসায় আত্মীয়দের কাছে রেখে কাশীতে দরবেশজীর আশ্রমে বেড়াতে যান। দরবেশজী তখন কাশীতে তাঁর বিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে বাস করছিলেন।

ইন্দুবাবু দরবেশজীর আশ্রমে গিয়ে তাঁকে দেখেই মহা বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন— এইতো সেই ব্যক্তি, এঁকেই তো আমি সেদিন স্বপ্নে দেখেছিলাম। ইনিই আমার নৌকা নামিয়ে দিয়েছিলেন। এঁকে আগে কোনদিন দেখিনি, অথচ এই চেহারাই আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। আশ্চর্য তো।

এরপর মুগ্ধ ইন্দুবাবু দরবেশজীর পা'দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন— আমায় সাধন দিন।

উত্তরে দরবেশজী বললেন— আমার কাছে সাধন আছে, তোমাকে কে বললে?

ইন্দুবাবু বললেন— আমি জানি। আপনি আমাকে দর্শন দিয়েছেন।

— কি বলছ? দর্শন দিয়েছি। আমি তো কাউকে একবার দেখলে, ভুলি না। তোমাকে কখনো কোথাও দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

— আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি।

— ও, সেই নদীর চড়ায় নৌকা আটকানোর কথা বলছ

দরবেশজীর মুখে নদীর চড়ায় নৌকা আটকানোর কথা শুনে ইন্দুবাবু আরও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ভাবলেন, আমি যা স্বপ্নে দেখিছি, ইনি তা জানলেন কি করে?

যাই হোক্, ইন্দুবাবুর ঐকান্তিক প্রার্থনায় দরবেশজী তাঁকে দীক্ষা দিতে স্বীকৃত হলেন।

এবার তিনি ইন্দুবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি সস্ত্রীক দীক্ষা নেবে তো? এবং তোমার পিতামাতার আদেশ নিয়ে এসেছ তো?

— পিতা জীবিত নাই, তবে মা'র আদেশ নিয়েছি।

এরপর দরবেশজী একটু চিন্তা করে বললেন— তোমাদের দীক্ষা নিতে দিন কয়েক, অন্ততঃ ৪/৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এখনই হবে না।

দীক্ষালাভের জন্য ব্যাকুলতায় ইন্দুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন— আজ কালের মধ্যে হবে না কেন?

দশবেশজী বললেন— বাড়ী গিয়ে তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞসা কোরো, তাহলেই জানতে পারবে। তাঁর দীক্ষা পাওয়ার বাদা আছে।

ইন্দুবাবু বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, মাত্র ঘণ্টাখানেক পূর্বেই তিনি রজঃস্বলা হয়েছেন।

স্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে ইন্দুবাবু আরও বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং ভাবতে লাগলেন— আশ্চর্য তো। দরবেশজী আশ্রমে বসে কি অলৌকিক শক্তির বলে, একথা জানলেন।

করুণানিধানের দৈব কৃপালাভ

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যাঁরা মিশেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন, তিনি শুধু আকৃতিতেই নয়, প্রকৃতিতেও সত্যকার একজন সাধু মানুষ ছিলেন।

এই ধার্মিক মানুষটির জীবনে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। এখানে তার একটি কাহিনী বলছি। এই কাহিনীটি আমি করুণানিধানবাবুর বিশেষ স্নেহভাজন এবং তাঁর স্বদেশ শান্তিপুর নিবাসী সাহিত্যিক শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনেছি। কাহিনীটি এই :

করুণানিধানবাবু একবার হিমালয়ের তীর্থগুলি দর্শনে বেরোন। প্রথমে তিনি হরিদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হন। এবং কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন।

ঐ সময় একদিন তিনি হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ তীর্থে যান। হৃষিকেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে কবি বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে তিনি গভীর জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হন, এবং পথও হারিয়ে ফেলেন।

পথ খুঁজে বার করতে গিয়ে তিনি আরও জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। এদিকে সন্ধ্যাও তখন নেমে এসেছে।

হিংস্র জন্তুসঙ্কুল বন ও পাহাড়ের মধ্যে এইভাবে পথ হারিয়ে কবি মহা ভাবনায় পড়লেন।

পথ খুঁজে পাওয়ার আর আশা নেই দেখে, ক্লান্ত কবি এবার একটি পাথরের উপর বসে বিপদতারণ ভগবানকে একমনে ডাকতে লাগলেন। ভগবানকে ডেকে কবি এই প্রার্থনা করলেন— হে ভগবান এই বনের মধ্যে অন্ততঃ একটা লোককেও একবার দেখিয়ে দিন, যাকে অবলম্বন করে আমি বন থেকে বেরিয়ে যেতে পারি।

কবি এই প্রার্থনা করে সামনে চোখ মেলতেই আশ্চর্য হয়ে দেখলেন— একটি গ্রাম্য লোক একটা লাঠির মাথায় পুঁটুলি বেঁধে লাঠিটা কাঁধে করে তাঁর সামনে বনের মধ্য দিয়ে পথ করে করে চলে যাচ্ছে।

লোকটিকে দেখতে পেয়েই কবি আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে, লোকটিকে ডাকতে লাগলেন।

লোকটি কিন্তু কোন উত্তর না দিয়েই যেমন চলছিল, তেমনই চলতে লাগল।

করুণানিধানবাবু চীৎকার করে ডেকে লোকটিকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

লোকটি একবারও কিন্তু করুণানিধানবাবুর দিকে তাকালও না এবং তাঁর অত ডাকাডাকির কোন উত্তরও দিল না। সামনে বনের মধ্য দিয়ে পথ করে চলতে লাগলো।

ক্রমে লোকটি বন থেকে ফাঁকায় এল। করুণানিধানবাবুও তাকে অনুসরণ করে ফাঁকায় এসে পড়লেন। ফাঁকায় এসে করুণানিধানবাবু এবার লোকটিকে ধরবার জন্য ছুটতে লাগলেন। অত ছুটেও তিনি লোকটির সঙ্গে তাঁর যে পথের দূরত্ব বরাবর ছিল, তার একটুও কমাতে পারলেন না। অথচ লোকটি যেমন চলেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই চলছিল।

লোকটি শেষে একটা রেললাইনের কাছে এসে, রেললাইন পার হয়ে, বাঁধের অপর পারে গিয়েই মিলিয়ে গেল।

করুণানিধানবাবুর লোকটিকে অনুসরণ করে রেললাইন পর্যন্ত এলেন। তারপর রেললাইনের কাছে এসে লোকটিকে আর দেখতে পেলেন না।

লোকটি এইভাবে পথ দেখিয়ে এনে রেললাইনের কাছে এসেই হঠাৎ আদৃশ্য হওয়ায় করুণানিধানবাবু আরও বিস্মিত হয়ে গেলেন।

তখন চারিদিকে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। তিনি বিস্মিত হয়ে রেল লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে সেই অদৃশ্য মানুষটির কথা ভাবতে লাগলেন।

এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন, পাশেই রেলওয়ের একটা গুম্‌টি ঘরে মিট্ মিট্ করে আলো জ্বলছে।

করুণানিধানবাবু গুম্‌টি ঘরের কাছে গিয়ে দেখলেন— একটি লোক আলো জ্বেলে বসে আছে।

করুণানিধানবাবু গুম্‌টি ঘরের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন— আপনি কি এইমাত্র একটি লোককে রেললাইন পার হতে দেখলেন?

লোকটি উত্তরে বললেন— না, কই, কেউ তো যায়নি। তা ছাড়া, এখন এখানে আসবে কে মশায়

— আমি যে সেই লোকটিকে অনুসরণ করেই এখান পর্যন্ত এসেছি।

— তা, আমি কই কাউকে দেখিনি।

— আচ্ছা, এখান থেকে স্টেশন কতদূর বলতে পারেন?

— তা অনেক দূর। কোথায় যাবেন আপনি?

— হরিদ্বার। এখানে কি কোন লোকালয় নেই?

— এই বনের মধ্যে আবার লোকালয় কোথায়। অনেকটা দূরে কয়েক ঘরের বাস আছে।

— আপনার এখানে আমাকে রাতটা থাকতে দেবেন?

— আমি তো থাকব না। দুন্ এক্সপ্রেস এখনি যাবে, আমি শুধু লাইন ক্লীয়ার দেখাতে রয়েছি। গাড়ী চলে গেলে আমিও চলে যাব।

— এখনি কি গাড়ী আসছে?

— হ্যাঁ, ওইতো দেখুন না সিগ্ন্যাল পড়ে গেছে, সবুজ আলো দেখা যাচ্ছে।

করুণানিধানবাবু গাড়ী আসছে শুনেই একটু আশান্বিত হলেন।

কিন্তু আশান্বিত হলে কি হবে ওতো এক্সপ্রেস গাড়ী। তা ছাড়া পথের মধ্যে হঠাৎ কোন গাড়ী থামবেই বা কেন। কিন্তু তবুও তিনি আশান্বিত হয়েই সেইখানে দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন— ভগবান। একটি মুহূর্তের জন্য গাড়ীটা একবার এইখানে থামিয়ে দিন। আমি তাহলে উঠে পড়ি।

দেখতে দেখতে যথাসময়ে গাড়ী এসে গেল এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুন এক্সপ্রেস মেল ট্রেন হয়েও কি কারণে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সেইখানে দাঁড়িয়ে গেল।

করুণানিধানবাবু অমনি ছুটে গিয়ে সামনে যে কামরা পেলেন, তাতেই উঠে পড়লেন।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীও ছেড়ে দিল।

করুণানিধানবাবু যে কামরায় উঠেছিলেন, সেটা ছিল প্রথম শ্রেণীর কামরা।

গাড়ী হরিদ্বারে গিয়ে থামলে, টিকিট চেকার এসে করুণানিধানবাবুর কাছে টিকিট চাইলেন। তিনি চেকারকে টিকিট দিতে পারলেন না।

তখন চেকার দেরাদুন থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত ফাইন সহ প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দাবী করলেন।

করুণানিধাবাবুর কাছে বেশী টাকা ছিল না। তিনি তখন নিরুপায় হয়ে, তাঁর হৃষিকেশে পথ হারানো থেকে গাড়ীতে ওঠা পর্যন্ত সমস্ত কাহিনীই চেকারকে শোনালেন।

চেকার করুণানিধানবাবুর কোন কথাই শুনতে চাইলেন না। তিনি তাঁকে স্টেশনমাস্টারের কাছে নিয়ে গেলেন।

করুণানিধানবাবু স্টেশনমাস্টারের কাছেও তাঁর গাড়ীতে ওঠা পর্যন্ত সমস্ত কাহিনীই বললেন।

স্টেশনমাস্টার একজন ইউরোপীয়ান ছিলেন। তিনি শুনে হেসে বললেন— মেল ট্রেন আপনাকে তুলে নেবার জন্য পথের মধ্যে থেমে ছিল, একথা বিশ্বাস করতে হবে?

করুণানিধানবাবু জোর দিয়ে তাঁর কথা বললে, তখন স্টেশনমাস্টার কৌতূহল বশেই গার্ডকে একবার জিজ্ঞাসা করতে গেলেন।

স্টেশনমাস্টার গার্ডকে জিজ্ঞাসা করলে, গার্ডসাহেব বললেন— হ্যাঁ, হৃষিকেশের কাছে পথের মধ্যে গাড়ীটা একবার কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থেমেছিল বটে।

এবার স্টেশনমাস্টার আশ্চর্যান্বিত হয়ে করুণানিধানবাবুর মুখের দিকে চেয়ে তাঁকে বললেন— যান্, আপনাকে আর ভাড়া দিতে হবে না। ভগবান যখন আপনাকে এইভাবে বনের মধ্য থেকে এখানে এনে দিয়েছেন, তখন আমরা আর ভাড়া নিতে পারব না।

করুণানিধানবাবুও স্টেশনমাস্টারকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভগবানের অশেষ করুণার কথা ভাবতে ভাবতে হরিদ্বারে তাঁর বাসার দিকে রওনা হলেন।

রামপদবাবুর কাছে শোনা করুণানিধানবাবুর এই ঈশ্বর কৃপালাভের কাহিনীটিই একটু সংক্ষিপ্ত আকারে ১৩৬১ সালের ফাল্গুন মাসের শনিবারের চিঠির 'করুণানিধান সংখ্যায়' আমি পড়েছিও। শ্রীস্মরিৎ শেখর মজুমদার করুণানিধানবাবুর মুখে এই কাহিনীটি শুনে, লিখে শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের কাছে পাঠালে, সজনীবাবু সম্পাদকীয়র মধ্যে স্মরিৎশেখরবাবুর সমস্ত লেখাটিই উদ্ধৃত করেছিলেন।

রামপদর তন্দ্রাবস্থায় অলৌকিক দর্শন

সাহিত্যিক রামপদ মুখোপাধ্যায় সেবার সপরিবারে পুরীতে বেড়াতে গেছেন। পুরীতে গিয়ে তিনি ভারত সেবাশ্রম সংঘের ধর্মশালায় রয়েছেন।

সেখানে একদিন দুপুরে আহারের পর তিনি বিশ্রাম করবার জন্য একটু শুয়েছেন। নিদ্রা যাননি, সবে তন্দ্রা এসেছে মাত্র। এমন সময় তিনি তন্দ্রার মধ্যেই যেন পরিষ্কার দেখতে পেলেন— শান্তিপুরে তাঁর দেশের বাড়ীতে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৃসিংহ পদ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র বালক শ্রীমান্ নারায়ণ খুব উঁচু একটা জায়গা থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়েই একটা হাত ভেঙ্গে যন্ত্রণায় ভীষণ চীৎকার করে উঠল।

এই দৃশ্য দেখেই রামপদবাবু চম্‌কে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর তন্দ্রাও ভেঙ্গে গেল।

রামপদবাবু ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে ভাবতে লাগলেন— তাইতো, এ রকমটা কেন হ'ল? এ যে ঘুমের মধ্যে ঠিক স্বপ্নও নয় কেন না ঘুমই যে তখনো আসেনি। কেবল তন্দ্রা এসেছিল মাত্র।

রামপদবাবু তখনই তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে ডেকে সমস্ত ঘটনাটা বললেন।

মৃণালিনী দেবী শুনে একটা সত্যকার অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীতা হলেন।

রামপদবাবুও যে চিন্তিত হলেন না, তা নয়। তিনি তখনই বাড়ীর কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে, দেশের চিঠি দিলেন। চিঠিতে আবশ্য তিনি তাঁর তন্দ্রাবস্থায় দেখা ঘটনাটির কথা আর উল্লেখ করলেন না।

রামপদবাবুর চিঠি দেশে পৌঁছবার আগেই, যেদিন তিনি চিঠি দিয়েছিলেন, সেই দিনেই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত শ্রীমান নারায়ণের পিতা, বাড়ীর সংবাদ জানিয়ে তাঁকে একটি চিঠি দেন।

রামপদবাবু যথাসময়ে ভাইপোর লেখা চিঠি পেয়ে পড়ে দেখলেন যে, ভাইপো লিখেছেন— আজ দুপুরের সময় নারায়ণ জাম গাছে জাম পাড়তে উঠেছিল। জামগাছের খুব উঁচুতে উঠে ডাল ভেঙ্গে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে তার একটা হাত ভেঙ্গে গেছে এবং মাথাতেও গুরুতর আঘাত পেয়েছে।

রামপদবাবু চিঠি পড়ে মিলিয়ে দেখলেন, পুরীতে ধর্মশালায় শুয়ে ঠিক যে সময়ে তিনি তন্দ্রার মধ্যে ঘটনাটি দেখেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই নারায়ণ গাছ থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভাঙ্গে।

রামপদবাবু চিঠি পড়ে মহা বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন— এতদূরে বসে তন্দ্রার মধ্যে কি করে আমি ঘটনাটাকে অমন পরিষ্কার দেখতে পেলাম। এ কি অলৌকিক ব্যাপার

এরপর তিনি তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্যদের, বাড়ীর চিঠির কথা শোনালেন। তাঁরাও সকলেই শুনে অবাক হয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ সেনের বর্ণিত অলৌকিক ঘটনা

আলোর পাহাড়, ধূপদান, জলপরী প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা এবং অধুনালুপ্ত "মোহন বেণু" পত্রিকার সম্পাদক, প্রবীণ শিশু সাহিত্যিক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনের সহিত একদিন আমার "অলৌকিক কাহিনী" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

পাণ্ডুলিপির কয়েকটি কাহিনী শুনে তিনি বললেন— আমার প্রত্যক্ষ করা একটি অলৌকিক কাহিনী তবে আপনায় বলছি, শুনুন।

এই বলে তিনি কাহিনীটি বলতে লাগলেন :

আমি বিপত্নীক মানুষ। আর আমার ছেলেমেয়েও নেই। একা লোক। তাই যখন যেখানে পাই, সেখানেই থাকি। আমি তখন আসানসোলে আমার ছোট ভাইএর বাসায় আছি।

সেই সময় একদিন সকালে আমি ঘুম থেকে উঠেই শুনি, আমার ভ্রাতৃবধূ তাঁর এগার বছরের কন্যা ডলিকে (ডলির ভাল নাম কণিকা) তীব্র তিরস্কার করছেন।

ডলিকে কাছে টেনে এনে, ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করলে, সে বললে— দেখ না জ্যাঠামশায়, মা আমাকে শুধু শুধু বকছে। আমি যা দেখেছি, তাই তো বলেছি। এতে আমার দোষটা কোথায়?

আমি বললাম— কি এমন দেখেছ? যার জন্য তোমায় বকুনি খেতে হচ্ছে।

উত্তরে ডলি বলতে লাগল— আমি ঘরে ঘুমুচ্ছিলাম। এমন সময় কে যেন এসে কপাটে ধাক্কা দিচ্ছিল। আমি কপাটে ধাক্কা শুনে, উঠে কপাট খুলে দেখি, একজন লোক দাঁড়িয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম— কাকে চাই?— লোকটি উত্তরে বললে— আমি গান্ধী। মরে গেছি।— এই বলেই লোকটি চলে গেল। এই কথাটাই আমি মাকে বলেছি। তা মা তো শুনেই আগুন। বলে— হতচ্ছাড়া মেয়ে, তিনি এখন দিব্যি বেঁচে আছেন এবং দিল্লীতে প্রতিদিন বিকালে প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, আর তিনি কিনা এসে ওকে বলে গেলেন— আমি গান্ধী। মরে গেছি। — আর দুনিয়ার কোথাও লোক পেলেন না, ওকে বলতে এলেন

আমার ভ্রাতৃবধূ অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমি তাঁকে সম্বোধন করে বললাম— ডলি স্বপ্ন দেখেছে বই তো নয়। এ রকম মরার স্বপ্ন অনেকেই দেখে থাকে। তাতে আর কি হয়েছে। এ জন্য শুধু শুধু বকাবকি কেন? চুপ করে যাও।

আমার এই কথার উত্তরে ডলি আবার জোর দিয়ে বললে— না জ্যাঠামশায়, স্বপ্ন নয়। সত্যিই কে একজন এসে কপাটে ধাক্কা দিচ্ছিল, আর আমি কপাট খুললে, আমাকে ঐ কথা বলে গেল। দেখলাম, লোকটা যেন কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। কপাটে ধাক্কা না শুনলে, আমি কখনো এই শীতে লেপ ছেড়ে উঠি

আমি ব্যাপারটা থামিয়ে দেবার জন্যই বললাম— ওই স্বপ্নই তুমি তো তখন ঘুমুচ্ছিলে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই কপাটে ধাক্কা শুনেছ তো

ডলি বললে— কিন্তু জ্যাঠামশায়, আমি যে কপাট খুলে পরিষ্কার লোকটিকে দেখলাম। আর সে আমাকে ওই কথাটা বলে গেল।

ডলির এই কথা শুনে তার মা এবার তাকে তিরস্কার করে বললেন— পরিষ্কার তোমার মাথামুণ্ড দেখেছ

আমি শেষে ডলিকে বললাম— আচ্ছা যাক্, একথা আর কাউকে বোলো না।

এরপর সারাদিন নানা কাজের ভিতর দিয়ে কেটে গেল। ডলির সকালের ওই স্বপ্নদৃষ্টই হোক্ বা প্রত্যক্ষ করাই হোক্, কথাটি একেবারে ভুলেই গেলাম।

সন্ধ্যার দিকে আসানসোলের ডি. এম. ও-র অফিসে গেছি। যেতেই রেডিওয় শুনতে পেলাম— মহাত্মা গান্ধী মাত্র কিছুক্ষণ আগে প্রার্থনা সভায় যাওয়ার পথে আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।— রেডিওয় এই সংবাদ তখন পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে আমি বাড়ী ফিরলাম। ততক্ষণে আমাদের বাড়ীর সকলেও গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে গেছে।

আমি বাড়ী ফিরলে ডলি আমার কাছে এসে বললে— জ্যাঠামশায়, দেখলে তো আমি যে পরিষ্কার লোকটিকে দেখেছিলাম, এবং সে আমাকে ঐ কথাই বলেছিল।

ভ্রাতৃবধূ অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এবার আর ডলির কথার কোন উত্তর দিলেন না।

রবীনবাবু আমাকে এই কাহিনীটি শুনিয়ে শেষে বললেন— আমার মনে হয় কি জানেন, মহাপুরুষরা পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পূর্বেই, মাতা ধরিত্রী যেন সেটা টের পান। তাই গান্ধীজী চলে যাওয়ার আগেই এ রকমটা হয়েছিল। তবে অবশ্য, কে যে এসে বলে গেলেন, এবং আর কাউকে না বলে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকেই বা কেন বললেন, সে অলৌকিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম— আপনার সেই ভ্রাতুষ্পুত্রী কি এখনও বেঁচে আছেন?

রবীনবাবু বললেন— এখন আর তার বয়স কত, ২৫/২৬ আমরা তার বিয়ে দিয়েছিলাম। সম্প্রতি সে একটি পুত্র সন্তান নিয়ে বিধবা হয়েছে। সে এখন তার পুত্রসহ আসানসোলে তার পিতা জিতেন্দ্রনাথ সেনের কাছেই থাকে।

রবীনবাবু এরপর বললেন— আপনাকে প্রায় ঐ ধরণেরই আর একটা কাহিনী বলছি, শুনুন। এটা অবশ্য আমার প্রত্যক্ষ করা নয়, তবে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর দেখা। সে কাহিনীটি এই :

আমার ঐ বন্ধুটির নাম রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বর্তমানে বার্ণপুরের লৌহ কারখানার একজন মস্ত বড় অফিসার। রবির জন্মস্থান ঢাকা জেলার বিক্রমপুর। রবির বয়স তখন ১৮/১৯। রবি এবং তার এক পিসতুতো ভাই, তারা উভয়ে তখন ঢাকা শহরে থেকে কলেজে পড়ত। এক হোস্টেলে একই কক্ষে তারা মামাতো-পিসতুতো দুভাই থাকতো। একদিন হ'ল কি, রবির পিসতুতো ভাইটি কলেজ থেকে এসেই তার বিছানাপত্র বাঁধতে সুরু করল। রবি তখন ঘরে ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল— কি হ'ল রে? বিছানা বাঁধছিস কেন?

রবির পিসতুতো ভাই উত্তর দিল— আমি এখনই বাড়ী যাব।

— কি হ'ল? হঠাৎ বাড়ী যাবি কেন?

— আমি টেলিগ্রাম পেয়েছি, বাবার ভারী অসুখ।

— কই টেলিগ্রাম? দেখি।

— না, আমি পেয়েছি

— কি আশ্চর্য টেলিগ্রামটা দেখানা?

— সে দেখানো যাবে না, আমি মনে মনে জানতে পেরেছি। বাড়ী থেকে আমাকে টেলিগ্রাম করেছে। বাবা অসুস্থ, আমাকে এখনি যেতে হবে।

রবি তাকে বোঝাল। বললে— তুই কি পাগল হ'লি নাকি? বাড়ীর জন্যে তোর মন টান্‌ছে, বুঝতে পেরেছি। তা যাস্ যাবি। এখনি এই সন্ধ্যায় কেন? রাতটা থাক, কাল সকালেই যাবি।

রবি তাকে বুঝিয়ে, অতি কষ্টে রাতটার মতো আটকে রাখল।

পরদিন সকালে রবির সেই পিসতুতো ভাই বাড়ী যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে, এমন সময় সত্যই তার নামে একটা টেলিগ্রাম এল, এবং সে টেলিগ্রাম তার বাবার মৃত্যু সংবাদ বহন করে আনল।

রবি টেলিগ্রাম পড়ে দেখল, গত ভোরেই তার পিসেমশায় মারা গেছেন।

আগের দিন বিকালেই রবির পিসতুতো ভাই যদি বাড়ী রওনা হ'ত, তাহলে সে বাড়ী গিয়ে তার বাবাকে দেখতে পেত।

এই গল্পটি বলে, রবীনবাবু আমাকে বললেন— দেখুন, এ ক্ষেত্রেও প্রকৃত টেলিগ্রাম করার আগেই ওই ছেলেটি মনে মনে টেলিগ্রাম করার কথা কিভাবে জানতে পেরেছিল। এ সব কি করে যে হয়, তা বুঝতে পারি না।

রবীনবাবু আর একদিন বলেছিলেন— আমার আর এক বিশিষ্ট বন্ধুর জীবনের কয়েকটি অলৌকিক কাহিনী আজ আপনাকে শোনাব। তবে সেগুলি আসলে এক সাধুরই অলৌকিক শক্তির কাহিনী। আমার বন্ধুটি সেই কাহিনীগুলির সঙ্গেই জড়িত।

আমার ওই বন্ধুর নাম তপোকৃষ্ণ ঘোষ। ইনি ভাগলপুর কোর্টের একজন প্রখ্যাত উকিল। আজও জীবিত আছেন। আর যাঁকে নিয়ে এই কাহিনীগুলি, সেই সাধুর নাম হচ্ছে অন্ধবাবা। অন্ধবাবা প্রকৃতই অন্ধ ছিলেন। তাঁর আশ্রম হচ্ছে হাজারীবাগ রোড স্টেশনের নিকট সুরিয়ায়। সে এক বিখ্যাত আশ্রম। সে আশ্রম আজও সগৌরবে বর্তমান।

আমি নিজে যদিও অন্ধবাবার শিষ্য নই। তবে বন্ধু তপোকৃষ্ণের সঙ্গে আশ্রমে গিয়ে গিয়ে অন্ধবাবার প্রসিদ্ধ শিষ্যদের সকলের সঙ্গেই আমি পরিচিত।

হ্যাঁ, অন্ধবাবার যে অলৌকিক শক্তির কথা বলছিলাম। সেগুলি হচ্ছে :

১. উকিল তপোকৃষ্ণের মুহুরীর নাম মনোমোহন। মনোমোহনের বাড়ী তপোকৃষ্ণের বাড়ীর নিকটেই। একসময় মনোমোহন হঠাৎ মারা যায়।

সেদিন অন্ধবাবা ভাগলপুরের কাছেই এক আশ্রমে এসেছিলেন। মনোমোহনের মৃত্যু সংবাদ পেয়েই কি ভেবে তপোকৃষ্ণ অন্ধবাবার কাছেই আগে ছুটে গেল। গিয়ে বললে— বাবা, মনোমোহন তো মারা গেল।

অন্ধবাবা বললেন— হ্যাঁ, তা তো দেখছি।

তপোকৃষ্ণ এবার বললে— বাবা, মনোমোহনকে আর কি বাঁচানো যায় না?

শুনে অন্ধবাবা বললেন— আচ্ছা, নিয়ে আয় দেখি আমার জপের মালাটা।

জপের মালাটা এনে দিলে, অন্ধবাবা মালা নিয়ে জপ করতে লাগলেন। এবং কিছুক্ষণ পরে বললেন— যা এবার গিয়ে দেখগে যা।

অন্ধবাবার এই কথা শুনেই তপোকৃষ্ণ মনোমোহনের মৃতদেহের কাছে ছুটে গেল। গিয়ে দেখল— মনোমোহন শয্যায় শুয়ে নড়ছে, এবং তার দেহে পুনরায় প্রাণ ফিরে এসেছে।

এই দেখে তপোকৃষ্ণ এবং মনোমোহনের বাড়ীর সকলেই মহা বিস্ময়ের সহিত যারপর নাই আনন্দিত হলেন।

এরপর তপোকৃষ্ণ গুরুকে সংবাদটা দিতে গিয়েই দেখে, এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অন্ধবাবা একেবারে জরাব্যাধিগ্রস্ত হয়ে জবুথবু হয়ে গেছেন।

তপোকৃষ্ণ গুরুর এই অবস্থা দেখে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে— বাবা, এ কি করলেন? এমন হবে জানলে তো আমি আপনাকে বলতাম না।

শুনে অন্ধবাবা শিষ্যকে আশ্বাস দিয়ে বললেন— ও কিছু নয়, ভয় নেই। দিন কয়েক এ অবস্থা থাকবে। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

এদিকে দু এক দিনের মধ্যেই মনোমোহন বেশ সুস্থ হয়ে উঠল।

অন্ধবাবা অবশ্য আরও কয়েক দিন পরে তাঁর পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন।

অন্ধবাবার এই কাহিনীটি ব'লে, রবীনবাবু বলেছিলেন— এ ক্ষেত্রে মনোমোহনের সত্যই মৃত্যু হয়েছিল, না কি সে মৃতকল্প হয়েছিল, তা জানি না। তবে লোকে যে নিজের আয়ু দান করে অপরকে বাঁচাতে পারে বা অপরের জরা ব্যাধি নিজের শরীরে নিয়ে আসতে পারে, তা অবিশ্বাস করা যায় না। শুনেছি এ কেউ কেউ পারেন, আর সাধুরা তো পারনেই। তাই পিতা যযাতিকে পুরুর যৌবন দান, কি পুত্র হুমায়ূনকে বাবরের আয়ু দান মোটেই অবিশ্বাস করার নয়।

২. একবার অন্ধবাবা তপোকৃষ্ণর ভাগলপুরের বাড়ীতে এসেছেন। সেই সময় একদিন বিকালে তপোকৃষ্ণ গুরুদেবকে নিয়ে ভাগলপুরেই গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেরুলেন। সঙ্গে তপোকৃষ্ণের স্ত্রীও রইলেন।

গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটেই সকলে বেড়াচ্ছিলেন। অনেকটা দূরও চলে গেছেন। এমন সময় একটা জায়গায় গেলে, অন্ধবাবা সেইখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে তপোকৃষ্ণের স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন— দেখ খুকু, আজ থেকে ঠিক বার বছর পরে তুমি মারা গেলে, তোমার মৃতদেহটাকে ঠিক এই জায়গায় এনে পুড়িয়ে যাবে।

অন্ধবাবার কথা শুনে খুকু এবং তপোকৃষ্ণ উভয়েই চমকে উঠলেন।

খুকু কম্পিত কণ্ঠে বললেন— আমি কি আর মাত্র বারটা বছর বাঁচব বাবা

অন্ধবাবা বললেন— হ্যাঁ, তারপর আর তোমার আয়ু নেই।

এবার তপোকৃষ্ণ বললে— বাবা, আয়ু কি বাড়ানো যায় না?

— না।

— কেন বাবা, মনোমোহনও তো মারা গেস্‌ল। সে তো আবার আয়ু ফিরে পেল।

— খুকুর তা হবে না। কেন না তারপর খুকুর আর আয়ু নেই।

খুকু বেশীদিন বাঁচবে না শুনে তপোকৃষ্ণের এবং খুকুর নিজের, উভয়েরই মন খারাপ হয়ে গেল। তখন তারা আর না আগিয়ে অন্ধবাবাকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল।

বাড়ী এসে তপোকৃষ্ণ স্ত্রীকে বোঝাল— তুমি বাবার কথায় মন খারাপ কোরো না। তুমি খুব করে ধর্মকর্ম করতে থাক। দেখবে নিশ্চয়ই তোমার আয়ু বেড়ে যাবে।

তপোকৃষ্ণ স্ত্রীকে এই কথা বলে নিজেও কিছুটা সান্ত্বনা পেল। তবে মন থেকে কিন্তু অন্ধবাবার কথাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না।

দেখতে দেখতে বারটা বছর কেটে গেল। আর আশ্চর্য যে, বার বছর পরে অন্ধবাবার নির্দিষ্ট ঠিক সেই দিনটিতেই খুকু অসুখে মারা গেল। তপোকৃষ্ণ স্ত্রীর অসুখে কত বড় বড় ডাক্তার দেখালো, কিন্তু কিছুই হ'ল না। খুকু মারাই গেল।

স্ত্রীর মৃত্যুতে তপোকৃষ্ণ খুবই কাতর হয়ে পড়ল।

এদিকে শব বাহকেরা যথাসময়ে মৃতাকে শ্মশানে নিয়ে গেল।

ছোট ছেলেমেয়েগুলি কান্নাকাটি করতে থাকায়, তপোকৃষ্ণ শ্মশানে যেতে পারল না। ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে রাখবার জন্য বাড়ীতে রয়ে গেল।

শব নিয়ে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে ছেলেমেয়েদের একটু ভুলিয়ে অপরের কাছে তাদের রেখে তপোকৃষ্ণ এবার শ্মশানের দিকে গেল।

তপোকৃষ্ণ শ্মশানে গিয়ে দেখল— সেখানে অন্য কয়েকটা মৃতদেহ দাহ করা হচ্ছে বটে, কিন্তু তার স্ত্রীর মৃতদেহ সেখানে দাহ হচ্ছে না। তখন তপোকৃষ্ণ তার স্ত্রীর চিতার সন্ধানে শ্মশান ছেড়ে গঙ্গার ধার ধরে আগিয়ে যেতে লাগল। খানিক দূর গেলে তার স্ত্রীর চিতা জ্বলছে দেখতে পেল। তখন তপোকৃষ্ণের, বার বছর আগে গুরুদেবের নির্দেশ করা ঐ জায়গাটির কথা মনে পড়ল।

তপোকৃষ্ণ শববাহকদের জিজ্ঞাসা করল— এতদূর এলে কেন?

তারা বললে— শ্মশানে অন্য মড়া পোড়াচ্ছে, জায়গা নেই। আর শ্মশানের আশপাশেও গঙ্গার ধারে তেমন সুবিধা মতো জায়গা পাওয়া গেল না। তাই একটু দূরেই এসে গেছি।

তপোকৃষ্ণ কোনো উত্তর দিল না। শুধু গুরুদেবের বার বছর আগের সেই মারাত্মক ভবিষ্যদ্বাণীর কথাই ভাবতে লাগল।

৩. তপোকৃষ্ণ এবার তার মুহুরী মনোমোহনকে নিয়ে এক বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে যায়। সেখানে ভূরিভোজ খেয়ে ফেরার সময় পথে তপোকৃষ্ণের কলেরার মতো হয়। পথে ভেদম বমি করে, তপোকৃষ্ণ একরূপ অজ্ঞান হয়েই একটা রেলস্টশনে পড়ে থাকে। সঙ্গে সেই মনোমোহন।

এমন সময় সেই স্টেশনে তাদের কাছে এসে একটা লোক চীৎকার করতে থাকে— এখানে তপোকৃষ্ণবাবু কে আছেন? তপোকৃষ্ণবাবু কে আছেন?

মনোমোহন লোকটির কাছে গিয়ে বললেন— তপোকৃষ্ণবাবু এই যে এখানে শুয়ে আছেন। তবে তিনি খুব অসুস্থ।

এবার সেই লোকটি বললে— ওঁকে নিয়ে চলুন. রাণীমা ওঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

মনোমোহন ও সেই লোকটি উভয়ে মিলে কোন রকমে ধরে তপোকৃষ্ণকে স্থানীয় রাণীমার বাড়ীতে নিয়ে গেল।

তপোকৃষ্ণ গেলে রাণীমা বললেন— আপনি অসুস্থ, যতদিন না সুস্থ হচ্ছেন, ততদিন এখানে থাকুন, তারপর সুস্থ হয়ে বাড়ী যাবেন।

অসুস্থ তপোকৃষ্ণ রাণীমার বাড়ীতে কয়েকদিন রয়ে গেল এবং সেরে তবে বাড়ী ফিরল।

তপোকৃষ্ণ বলে, ওই রাণীমাকে সে জীবনে কোনোদিন দেখেনি। এমন কি তার বাড়ীর কারও সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল না।

তপোকৃষ্ণের বিশ্বাস, অন্ধবাবাই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

৪. তপোকৃষ্ণ আর একবার এক জায়গায় কমিশনে যায়। সেবার মুহুরী মনোমোহন তার সঙ্গে ছিল না। এ একাই গেস্‌ল।

কমিশন সেরে সেখান থেকে ফিরতে অনেকটা রাত হয়ে গেল। তপোকৃষ্ণ খেয়াঘাটে এসে দেখে ঘাটে খেয়া নেই। আর লোকজনও আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। খেয়ারী যদি আশেপাশে নৌকা নিয়ে কোথাও গিয়ে থাকে, এই ভেবে তপোকৃষ্ণ খেয়ারী, খেয়ারী করে ডাকতে লাগল। কিন্তু কারও কোন সাড়া পেল না। তখন তপোকৃষ্ণ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল, তাইতো এই নির্জন নদী তীরে পড়ে থেকে সমস্ত রাতটাই কাটাতে হবে নাকি?

চিন্তিত তপোকৃষ্ণ তখন গুরুদেব স্মরণ করল এবং একটা কিছু উপায় করে দেবার জন্য গুরুদেবের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল, একটি পাটনী খেয়া নৌকা বাইতে বাইতে মাঝ নদী থেকে খেয়া ঘাটে তপোকৃষ্ণের কাছে এল। পাটনী নৌকা নিয়ে আসবার সময় তপোকৃষ্ণকে তিরস্কার করতে করতে এল। বলতে লাগল— এত রাত্রে কোথায় ছিলে? খেয়ারী খেয়ারী খেয়ারীর কি আর কাজ নেই সে কি খাবে না, ঘোমাবে না? তোমার জন্যে সারারাত খেয়াঘাটে পড়ে থাকবে নাও, নৌকায় ওঠ

তপোকৃষ্ণ কোন উত্তর না দিয়ে নৌকায় উঠল। তবে ভাবতে লাগল— এতদিন তো এই খেয়াঘাটে এত পার হয়েছি, কই এই মেয়েটিকে তো কোনোদিন দেখিনি।

যাই হোক, নৌকা অপর পারে গিয়ে ঠেকলে, তপোকৃষ্ণ তীরে নেমেই পিছন ফিরে দেখে, নৌকাও নেই, আর সেই পাটনীও নেই।

তপোকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে গেল। বিস্মিত তপোকৃষ্ণ ভাবল— এইভাবে পাটনীকে পাঠানো, এ ওই অন্ধবাবারই কৃপা।

মানুষের মৃত্যুর কথা নিয়ে রবীনবাবু আর একদিন আমায় বলেছিলেন— দেখুন, কার যে কখন কিভাবে মৃত্যু হয়, তা বলা যায় না। আর আমার মনে হয়, যার হাতে যার মৃত্যু লেখা আছে, তা হবেই। এ সম্বন্ধে আপনাকে আজ একটা এরূপ অলৌকিক ধরণেরই গল্প বলছি, শুনুন :

বাঁকুড়া জেলায় এক গ্রামে আমার এক বন্ধুর বাড়ী। আমার সেই বন্ধুটি একদিন তাঁর কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। বন্ধুর বাড়ী ঘর সবই মাটির, কোনটাই পাকা নয়। যাই হোক, তামাক শেষ হয়ে যাওয়ায়, তিনি কল্‌কেটা বদলে আর এক ছিলিম তামাক সেজে দেবার জন্য, তাঁর ভৃত্য কালিদাসকে ডাকলেন।

কালিদাস ৰাড়ীর ভিতরে ছিল। তাই বন্ধুটি যখন কালিদাস, কালিদাস, করে ডাকছিলেন, তখন বৈঠকখানায় উপস্থিত সকলেই দেখলেন— কালিদাস ডাক শুনেই যেন একটা সাপ সামনের ঘরের একটা দেওয়ালের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে।

এদিকে কালিদাসকেও একটু দূরেই আসতে দেখে সকলেই চীৎকার করে উঠলেন— ওরে এদিকে আসিস্ নে, আসিস্ নে। একটা সাপ আসছে, ওইদিক দিয়ে ঘুরে আয়।

এই কথা বলতে কালিদাস অন্য পথ দিয়ে ঘুরে আসতে গেল। সাপটাও আর না এসে ফিরে গর্তে গিয়ে ঢুকল।

কালিদাস অন্য পথ দিয়ে ঘুরে এসে কল্‌কে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে তামাক সেজে কল্‌কের আগুন ফুঁ দিতে দিতে বৈঠকখানায় আসার সিধা পথ দিয়েই আসতে লাগল। কালিদাস ভেবেছিল, সাপটা যখন তার গর্তে গিয়ে ঢুকেছে, তখন সে আর বেরুবে না। তাই সে সে নিশ্চিন্ত মনেই আসছিল।

কালিদাস আসছে, এমন সময় সাপটাও আবার বেরুচ্ছে দেখে, আমার বন্ধু ও তাঁর সঙ্গীরা পুনরায় চীৎকার করে উঠলেন— ওরে ঘুরে আয়, ঘুরে আয়, সাপটা আবার বেরুচ্ছে।

কালিদাস ঘুরে আসবার জন্য অন্য পথে গেল, সাপটাও আবার তার গর্তে গিয়ে ঢুকল।

এরূপ একটা বিষধর সাপকে অবাধে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া উচিত নয় ভেবে, আমার বন্ধুটি তখনই সাপটাকে ধরবার জন্য তাঁর সাঁওতাল প্রতিবেশীদের ডেকে আনলেন।

সাঁওতালরা এসে দেওয়াল খুলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সাপটাকে ধরে ফেলল এবং আছাড় দিয়ে দিয়ে মেরেও ফেলল।

মরা সাপটাকে উঠানে রেখে সাঁওতালরা পাওনা টাকা নেবার জন্য বসে আছে। অনেক লোকও জমে গেছে। এমন সময় আমার বন্ধুর সেই ভৃত্য কালিদাস করল কি, একটা ছোট হাতখানেক শক্ত লাঠি নিয়ে সেটাকে দাঁড় করিয়ে সাপের মাথাটা থেতো করতে করতে বলতে লাগল— কালিদাসকে খাবি। কালিদাসকে খাবি।

এইরূপ করতে করতে হঠাৎ কিভাবে তার হাতটা একবার লাঠি থেকে ফস্‌কে সাপের মাথায় গিয়ে পড়ল। আর আপনি সঙ্গে সঙ্গেই সেই সাপটা— যেটাকে মৃত বলেই সবাই জেনেছিল— মাথা তুলে কালিদাসের হাতে ছোবল দিল।

যে সাঁওতালরা সাপটাকে ধরেছিল, তারা সঙ্গে সঙ্গেই কালিদাসকে কি সব গাছ-গাছড়ার ওষুধ খাওয়াল। মন্ত্র তন্ত্রও আওড়াতে লাগল। কিন্তু কিছুই হ'ল না। তখন আমার বন্ধুটি অন্য ওঝাও আনালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। সেই সাপের ছোবলেই কালিদাস মারা গেল। আর সাপটাও তখনই কালিদাসকে মেরে প্রকৃতই মারা গেল।

রবীনবাবুর কথা শুনে আমি বললাম— ঠিক ওই ধরণেরই একটি কাহ্নিী আমি কিছুদিন আগে 'যুগান্তর' পত্রিকায় পড়েছিলাম।

রবীনবাবু বললেন— সে কাহ্নিীটি কি শুনি।

আমি তখন বললাম— আপনারা ওই বন্ধুর মতোই এক জায়গায় কয়েকজন বসে আড্ডা দিচ্ছিল। এমন সময় তারা দেখল, তাদের পাশের বাড়ীর একটা লোক বাইরে এসে তার ছেলে মিহ্রিকে— মিহ্রি মিহ্রি করে ডাকছে।

লোকগুলি সকলেই আরও দেখল, মিহ্রিের বাবা যখনই মিহ্রি, মিহ্রি বলে ডাকে, তখনই মিহ্রি শুনে একটা সাপ সামনেই গর্ত থেকে মাথা বার করে ফণা তুলে দাঁড়ায়।

মিহ্রিের বাবাও সাপের এই কাণ্ড দেখল। তখন সে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে একটা কুঠার নিয়ে এল। এবং মিহ্রি বলে ডাকলে, সাপটা যেই গর্ত থেকে মাথা তুলল, অমনি সে সাপটার গলায় কুঠার দিয়ে একটা কোপ দিল।

আশ্চর্য যে মিহ্রিও ঠিক ঐ সময়টাতে তার বাবার ডাক শুনে কোথা থেকে ছুটে সেখানে এল।

এদিকে কুঠারে কাটা সাপের মাথাটা করল কি, ছিট্‌কে মিহ্রিের পায়ের উপরে গিয়ে পড়ল। এবং সেই কাটা মাথাই মিহ্রিের পায়ে শেষ ছোবল দিল। আর তাতেই মিহ্রিও সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। আর সাপটা তো গেলই।

রবীনবাবু শুনে বললেন— এগুলো অলৌকিকই। একে অলৌকিক ছাড়া আর কি বলা যায় কেননা সাপের হাতে কালিদাস, কি মিহ্রিের মৃত্যুর তবুও না হয় একটা অর্থ করা যায়। কিন্তু কেবল কলিদাস ডাক শুনেই বা মিহ্রি ডাক শুনেই গর্তের ভিতর থেকে সাপ বেরিয়ে আসবে, এর তো কোন অর্থই করা যায় না। এ রীতিমতো অলৌকিক ব্যাপারই।

ক্ষিরোদপ্রসাদের "অলৌকিক রহস্য"

নাট্যকার ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ "অলৌকিক রহস্য" নামে একটি মাসিক পত্রিকা কয়েক বৎসর সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকায় তিনি যে সব ভৌতিক, স্বপ্ন-ঘটিত, দৈব-ঘটিত প্রভৃতি অলৌকিক কাহিনীকে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন, সেই সব কাহিনীই প্রকাশ করতেন।

১৩১৭ সালের কার্তিক মাসের "অলৌকিক রহস্য" পত্রিকায় ক্ষিরোদবাবু এক ব্যক্তির লেখা "একটি পুরাতন অলৌকিক ঘটনা" নামক একটি কাহিনী প্রকাশ করেন। ক্ষিরোদবাবু এই কাহিনীটিকে সত্য বলেই বিশ্বাস করেছিলেন। অবশ্য কাহিনীটির লেখকও তাঁর লেখা কাহিনীটির সত্যতা প্রমাণের জন্য কোর্টের নজির পর্যন্তও উল্লেখ করেন। কেননা, ওই কাহিনীর অন্তর্গত টাকা পয়সা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে ১২৭৭ সাল নাগাদ হুগলীর ছোট আদালতে একটি মামলাও হয়েছিল। হুগলীর ছোট আদালতের তখন জজ ছিলেন, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। জজ তাঁর রায়ে কাহিনীটিকে সত্য বলেই নাকি স্বীকার করেছিলেন।

ওই কাহিনীর লেখক তাঁর লেখার ভূমিকায় বলেছেন— যদি কেহ এই কাহিনীটিকে অবিশ্বাস করেন, তাহলে তিনি ওই সময়কার হুগলী ছোট আদালতের কাগজপত্র দেখলেই সব জানতে পারবেন।

যাই হোক্, সেই কাহিনীটি এই :

একবার হুগলী জেলার কোন গ্রামের এক ব্রাহ্মণ দূরে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ী যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ সকালেই বাড়ী থেকে রওনা হয়েছিলেন। পথে দুপুর হয়ে যাওয়ায় তিনি মধ্যাহ্নের স্নানাহার সারবার জন্য পথিপার্শ্বে অপর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন।

ব্রাহ্মণ গেলে তাঁর আত্মীয়টি খুব আদর যত্ন করেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ওই আত্মীয়টির একটি কুকুর ছিল। সেও তার প্রভুর মতোই ব্রাহ্মণকে খুবই আদর আপ্যায়ন করতে লাগল। কুকুরটি ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে কতই না আপ্যায়নের ভাব দেখাতে লাগল। এবং কুকুরটি এক মুহূর্তের জন্যও ব্রাহ্মণের কাছ থেকে নড়ল না। ব্রাহ্মণ স্নান করতে গেলেন, কুকুরটিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পুকুর ঘাটে গেল। ব্রাহ্মণ স্নান সেরে এসে আহারে বসলেন। কুকুরটিও তখন তাঁর সামনে

বসে রইল। আহারের পর ব্রাহ্মণ বা'র বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপে শুতে গেলেন, কুকুরটিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেল এবং ব্রাহ্মণ শুলে কুকুরটি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর মাথার কাছে বসে রইল।

ব্রাহ্মণ চণ্ডীমণ্ডপে শুয়েই পথ হাঁটার শ্রমের জন্য অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখলেন— ওই কুকুরটি যেন তাঁকে বলছে— আমি আগের জন্মে তোর বাবা ছিলাম। বাড়ীতে গৃহদেবতাকে ভোগ না দিয়ে তাঁকে উপবাসে রেখে, আমি আগেই আমার আহার সেরে নিতাম। তারই জন্যে আমি এ জন্মে কুকুর হয়ে জন্মেছি। তুই এক কাজ কর, গয়ায় গিয়ে আমার নামে পিণ্ড দিয়ে আয়, তাহলে আমি উদ্ধার পাই।

ব্রাহ্মণ এরূপ অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে, ঘুম থেকে চমকে উঠে বিছানায় বসে দেখেন যে, কুকুরটি ঠিক তেমনি তাঁর দিকে চেয়ে তাঁর মাথার কাছে বসে আছে।

ব্রাহ্মণ বিছানা ছেড়ে উঠে চোখে মুখে জল দিলেন। তাঁর মনের মধ্যে এই স্বপ্নের কথাটা কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। ব্রাহ্মণ কি ভেবে ওই আত্মীয়র বাড়ী থেকে বিকালে আর বিদায় নিলেন না। রাত্রিটা তাঁর বাড়ীতেই থেকে গেলেন। এদিকে কুকুরটাও সমানে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরতে লাগল। ব্রাহ্মণ রাত্রে যথা সময়ে খেয়ে চণ্ডীমণ্ডপে এসে শুলেন। কুকুরটি দুপুর বেলার মত রাত্রেও তাঁর মাথার কাছে এসে বসে রইল।

রাত্রে ব্রাহ্মণ আবার স্বপ্ন দেখলেন— কুকুরটা তাঁকে আবার বলছে— তুই আমার কথা বিশ্বাস কর। তুই আমার পিণ্ড দে। যদি তোর টাকা না থাকে, তবে তুই বাড়ী যা, বাড়ী গিয়ে আমি যে ঘরে শুতাম, সেই ঘরের অমুক অমুক জায়গায় খুঁড়ে দেখগে, অনেক টাকা আছে। আমি মরবার সময় তোদের বলে যেতে পারিনি। সেই টাকা নিয়ে আমার পিণ্ড দে।

ব্রাহ্মণ সকালে ঘুম থেকে উঠে, কাকেও আর এই স্বপ্নের কথা কিছু না বলে, আত্মীয়টির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিধা একেবারে বাড়ী ফিরে গেলেন। গিয়ে স্বপ্নে যে যে জায়গায় টাকা পোতা আছে জেনেছিলেন, ঘরের সেই সেই জায়গাগুলো খুঁড়তে লাগলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ওই সব জায়গা খুঁড়ে তিনি প্রচুর টাকাও পেলেন।

স্বপ্নে নির্দিষ্ট জায়গায় এইভাবে টাকা পেয়ে, কুকুরটি যে তার পূর্বজন্মে তাঁর পিতা ছিল, একথা এবার ব্রাহ্মণের বিশ্বাস হল। তখন তিনি একদিন গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিয়ে এলেন।

পিণ্ড দিয়ে ফেরার সময় ব্রাহ্মণ কি ভেবে সেই কুকুরটিকে দেখবার জন্য তাঁর সেই আত্মীয়টির বাড়ীতে আগে গেলেন। গিয়ে কুকুরটির খোঁজ করলে, তাঁর আত্মীয়টি

বললেন— অমুক দিন অমুক সময়, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ কুকুরটা ছট্‌ফট্ করেই মারা গেল।

ব্রাহ্মণ শুনে মিলিয়ে দেখলেন, কুকুরটি যে সময় মারা যায়, ঠিক সেই সময়েই তিনি গয়ায় তাঁর পিতার নামে পিণ্ড দিয়েছিলেন।

এবার ব্রাহ্মণ তাঁর আত্মীয়টির কাছে সকল কথা খুলে বললেন। শুনে ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁর আত্মীয়টিও বিস্মিত হয়ে গেলেন।

যাই হোক, ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরে, তাঁর পিতার ওই গচ্ছিত টাকা দিয়েই কিছুদিন পরে একটা দ্বিতল পাকা বাড়ী তৈরী করালেন। এবং তাতে বসবাস করতে লাগলেন।

এই সময় ব্রাহ্মণের ছোট ভাই বিদেশে ছিল, বিদেশ থেকে বাড়ী এল। এসেই লোক পরম্পরায় শুনল যে, তার দাদা তার বাবার গচ্ছিত বহু টাকা পেয়েছে এবং তাতে ওই বাড়ী ঘর করেছে। তখন সে তার দাদার কাছে পৈতৃক টাকার অর্ধেক দাবী জানাল।

তার দাদা বললেন— আমি যা টাকা পেয়েছি, তাতে এই বাড়ীটাই হয়েছে। তার বেশী আর আমার কাছে কিছু নেই। তুমি বাড়ীর অর্ধেক নাও এবং নিয়ে তাতে বাস করো।

কিন্তু ব্রাহ্মণের ছোটভাই বললে— না, তুমি অনেক টাকা পেয়েছ, বাড়ী করার পরেও তোমার কাছে আরও টাকা আছে। অর্ধেক আমাকে দিতে হবে।

ব্রাহ্মণের কাছে যে নগদ আর কিছুই নেই, একথা তিনি তাঁর ভাইকে পুনঃ পুনঃ জানানো সত্ত্বেও, তাঁর ভাই কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না। তখন সে অর্থের দাবী করে তার দাদার বিরুদ্ধে স্থানীয় ছোট আদালতে নালিশ করল।

নালিশ হলে, তখন ব্রাহ্মণ তাঁর সেই আত্মীয়টি যাঁর বাড়ীতে কুকুর ছিল, তাঁকে সাক্ষী মানল এবং কুকুরের মৃত্যুর সময় ও গয়ায় পিণ্ডদানের সময় ইত্যাদি সমস্ত নজীর দেখাল।

জজ সাক্ষ্য প্রমাণে ব্রাহ্মণের কথা সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'রে তাঁকে রেহাই দিলেন।

জাতিস্মর সুরেন্দ্রনাথ

বিখ্যাত দার্শনিক, আলঙ্কারিক, কবি ও প্রাবন্ধিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বাল্যকালে জাতিস্মর হিসাবে এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন।

এ সম্বন্ধে সুশীল রায় তাঁর "মনীষী জীবন-কথা" গ্রন্থে লিখেছেন :

> তাঁর বয়স যখন দুই তিন বৎসর তখনই তাঁর জীবনে অস্বাভাবিক শক্তির লক্ষণ দেখা যায়। অক্ষর পরিচয় তখনো তাঁর হয়নি, কিন্তু এ সত্ত্বেও রামায়ণ পাঠ করতে পারতেন। এমন কি 'কাঞ্চন' কথাটির অর্থ পর্যন্ত বলে তিনি সকলকে চমৎকৃত করে দেন। এই সময় তাঁর খেলার জিনিষ ছিল অতি ক্ষুদ্র একটি কৃষ্ণের মূর্তি এবং সেই অনুপাতেরই একটি ছোট ভোগের পাত্র।

একটি শিশুর এই ভক্তিভাব দেখে এবং তাঁর এই আস্বাভাবিক ক্ষমতা দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করানো হয় এই শিশুটিকে। বিজয়কৃষ্ণ এঁর সঙ্গে কথা বলে অভিভূত হন, বলেন— এ এক জাতিস্মর বালক। এরপর সুরেন্দ্রনাথের নাম হ'ল 'খোকা ভগবান'। খোকা ভগবানের কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল চারিদিকে। দলে দলে লোকজন আসতে লাগল তাঁর কাছে। নানা জনের নানা প্রশ্ন। লোকের আনাগোনার বিরাম নেই। একটি শিশুর জীবন একটা বিরাট জনতার দ্বারা জীর্ণ হয়ে যেতে লাগল।

নেহাত কাহিনী বলে এই ঘটনাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়তো যেত। কিন্তু এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে আমলের সংবাদ পত্রে এই কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে।

১৩০১ সনের ৭ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৯শে এপ্রিল ১৮৯৪ তারিখের "সুলভ দৈনিক" সংবাদপত্রে 'অদ্ভুত বালক' শিরোনামায় এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে—

'ইংরেজি সংবাদপত্র 'হোপে' একটি অদ্ভুত বালক সম্বন্ধে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যথাযথ প্রকাশ করা গেল—

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নামক একটি সপ্তম বর্ষীয় বৈদ্য বালকের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। বালক বিদ্যালয় আখ্যান মঞ্জরী ও ইংরেজী বর্ণমালা পাঠ করে, সংস্কৃত এখনও পড়িতে শেখে নাই কিন্তু তাহাকে ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধে যে কোনো প্রশ্ন করা হউক না কেন, তৎক্ষণাৎ তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া বড় বড় দার্শনিককেও বিস্মিত করিয়া দেয় সম্প্রতি বালককে বেঙ্গল থিয়সফি সোসাইটির

গৃহে নানা লোকে নানা প্রকার কূট প্রশ্ন করে, সেই সকল প্রশ্নের উত্তর বালক দিয়াছে।...

এরপর নানা প্রশ্ন এবং তার উত্তর প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি বাহুল্য ভয়ে এখানে উদ্ধৃত করা হল না।

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় একদিন কথাপ্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের এই অলৌকিক ক্ষমতার কথা আমার কাছে বলেছিলেন। কালিদাসবাবু বললেন— আমি একবার সুরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা, আপনার বাল্যকালের সেই অদ্ভুত ক্ষমতাটা কি এখনও আছে?— উত্তরে তিনি বলেছিলেন— কি জানি ঠিক বুঝি না। তবে দর্শনের যে সব জিনিষ এখন পড়েশুনে জেনে বলছি; বাল্যকালে ওইসব কথাই না পড়েই বলে দিতে পারতাম।

কালিদাসবাবু আরও বললেন— সুরেনবাবু একবার আমার কাছে বলেছিলেন যে, মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী কিভাবে সুরেনবাবুকে কোথায় দেখে তাঁর ঐ ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিলেন। তারপর অনেক বছর কেটে যায়। সুরেনবাবু সেবার সদ্য এম. এ. পাস করে এক সভায় একটি অপূর্ব বক্তৃতা দেন। সেই সভায় মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীও উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা, সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে বক্তার পরিচয় জানতে চান। তখন বক্তাকে মহারাজার কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হয়। এবার মহারাজা সুরেনবাবুকে চিনতে পেরে বলেন— আপনার ছোটবেলায় আপনার মধ্যে যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেখেছি, তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য বিলাতে গিয়ে আরও কিছু পড়াশুনা করা আপনার দরকার। আর বোধকরি একটা বড় লাইব্রেরীও আপনার দরকার।

শুনে সুরেন্দ্রবাবু বললেন— আমি গরীবের ছেলে, বিলাত যাব কি করে, আর লাইব্রেরীর টাকাই বা পাব কোথায়?

উত্তরে মহারাজা বললেন— সেজন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি আপনার বিলাতের পড়ার খরচ বহন করব। আর একটা লাইব্রেরীর জন্যও টাকা দোব। কতো টাকা লাগবে ৫০/৬০ হাজার টাকা হ'লে লাইব্রেরী হবে তো?

সুরেন্দ্রবাবু বললেন— তা হবে।

— আমি দোব।

এরপর মহারাজা সুরেন্দ্রবাবুর বিলাতের পড়ার খরচ এবং লাইব্রেরীর জন্য উক্ত টাকা সমস্তই দিয়েছিলেন।

সেই জন্যই সুরেনবাবু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিরাট লাইব্রেরীটি (যাকে তিনি পরে আরও বড় করেছিলেন এবং যার মূল্য ছিল প্রায় দেড় লক্ষ টাকা) ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের মারফৎ যখন বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটিকে দান করেন, তখন বলেছিলেন যে, ওই লাইব্রেরীটি যেন ওখানে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর স্মৃতি হিসাবে থাকে। বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটিতে তাইই আছে।

ধূর্জটিপ্রসাদের টিপুদার স্বপ্ন

সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অলৌকিক ঘটনায় বিশেষ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ১৩৬৮ সালের "অমৃত" শারদীয় সংখ্যায় 'একটি সত্যি গল্প' নাম দিয়ে একটি অলৌকিক কাহিনী লিখেছিলেন। সেই কাহিনীটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

"এ রকম ঘটনা সত্যই আশ্চর্য রকমের। ঘটনাটি নিছক সত্য। তিলমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। হয়ত, বলবার সময় অনেকটা বাদই পড়েছে। এই ধরণের লেখা আমি কখনও লিখিনি ; এটা নির্মমভাবেই সত্য, অর্থাৎ কোথাও কল্পনার অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই।

আমার বোধ হয় বয়স তখন বাইশ-তেইশ। আমার মেজ ভাইটি মারা গেছে, কিন্তু বাড়ীর অন্য সকলেই বেঁচে। তবে অবশ্য কিছুদিন বাদে আমার দিদিমা মারা গেলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। তাঁকে আমরা ঘাট-murder করলাম, অর্থাৎ গঙ্গার ধারে তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় নিয়ে গেলাম এবং ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তিনি ঠিক গোধূলি-লগ্নে মারা গেলেন। তাই বাধ্য হয়ে আমার মামাতো ভাইকে আমাদের বাড়ীতেই থাকতে হোল; হালিসহরের তাঁর বাড়ীতে কেউ আর রইল না। আমার মামাতো ভাইএর নাম ত্রিপুরারি, ওরফে টিপু, অর্থাৎ টিপু সুলতান, বাবা তাঁকে তাই বলেই ডাকতেন। তিনি তাঁর ঠাকুরমার কাছেই হালিসহরে মানুষ হয়েছিলেন। একমাত্র সন্তান। তাই তাঁর পিসিমা, অর্থাৎ আমাদের মা'র কাছেই কোলকাতায় বসবাস করতে লাগলেন।

তাঁর সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে হয়। অন্যান্য গুণাবলীর কথা নাই তুললাম, যথা, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর দর্শনে পাণ্ডিত্য এবং অদ্ভুত রকমের সত্যবাদিতা। এখনকার ঘটনা এই— তাঁর নিজের মা জীবিত ছিলেন, এবং তিনি তাঁর মা'র ত্রয়োদশ বৎসরের দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর মাকে টিপুদা জননী বোলে ডাকতেন। শুচিবাই ছিল 'জননীর' প্রধান গুণ। একটু-আধটু নয়, গুরুতর, ভীষণ রকমের ; অর্থাৎ দরজা বন্ধ করে উলঙ্গ অবস্থায় ঘরদোর পরিষ্কার করতেন, পাছে কিছু দোষস্থ জিনিষ মাটিতে ছুয়ে যায়। ছ'মাস হালিসহরে থাকতেন তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে, এবং ছ'মাস তাঁর পিত্রালয়ে, ত্রিবেণীর কাছে বাঁশবেড়েতে। ছ'মাস প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় হালিসহরে গঙ্গারঘাটে স্নান করতে যেতেন। পাড়ার লোক বড় মানুষের পুত্রবধূ বলে সে সময় দরজা বন্ধ করে দিতেন। এই শুচিবাই আমি নিজে জানি। টিপুদার সঙ্গে তাঁর জননীর তিলমাত্র যোগ ছিল না।...

সেদিন সকালবেলায়, সাড়ে ছ'টার সময় আমি ওপরের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, নীচে অন্য সকলের জন্য চা তৈরী হচ্ছে, টিপুদা শোবার ঘর থেকে বাইরে এলেন। এসেই বাবাকে বল্লেন— পিসেমশাই, একটা স্বপ্ন দেখলাম, জননী যেন মারা যাচ্ছেন।— স্বপ্ন কি আর সত্যি হয় সত্যি হলে অবশ্য মন্দ হবে না। আরো একটা স্বপ্ন দেখলাম। একত্রেই যেন মনে হোলো। পিসীমা গঙ্গারঘাটে একটা বটতলায় যেন শুয়ে আছে। সেটা কি রকম হোলো? বুঝতে পারলাম না।

যাই হোক্, চা খাওয়া শেষ হোলো। এবং আমরা খবরের কাগজ পড়তে লাগলাম।

এর বোধ হয় মিনিট কুড়ি পরে, পনের মিনিট কি আধ ঘণ্টাও হতে পারে, একটা ক্রিং ক্রিং আওয়াজ এলো। চাকরে গিয়ে দরজা খুললে, সঙ্গে একটা 'তার' নিয়ে এলো। তার খোলার পর দেখা গেল, লেখা রয়েছে, 'আপনার মা অত্যন্ত অসুস্থ, তৎক্ষণাৎ চলে আসুন।'

একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বাবা বল্লেন— এ-রকম হয় বিশেষ কোন ঘটনার পূর্বে ছায়া জন্মাতে পারে। তাই থেকে স্বপ্ন আসে।

টিপুদা গম্ভীর হলেন।

তারপর আমার মা বল্লেন— ছোট বউ ত আমার বাড়ীর বউ। যদি অসুখ হয়েই থাকে, আমি তাকে দেখতে যাবো।

বাবার আপত্তি না শুনে তিনি যাবার জন্য তৎক্ষণাৎ তৈয়ারী হলেন।

টিপুদা আর আমার মা, অর্থাৎ তাঁর পিসীমা, দুজনে শিয়ালদা গেলেন। নৈহাটিতে নৌকা করে বাঁশবেড়ে যেতে হবে। নৈহাটিতে নামলেন, এবং কি দুর্বৈব আমার মা'র নৌকাতেই বুকের হাঁপ ধরল। মা অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তাঁকে নিয়ে হুগলী কাছারি বাড়ীতে হাজির করলেন। কোনো জায়গা না পেয়ে আদালতের কাছে একটা বটতলায় শুইয়ে দিলেন। একটু সুস্থ হবার পর মাকে নিয়ে একজন বড় উকিলের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হোলো। তিনি আমার মা'র বাবাকে ভালো করেই চিনতেন।

তাঁকে রেখে টিপুদা বাঁশবেড়ে গেলেন। প্রায় ভর সন্ধ্যেবেলায় নদীর ধারে জন চার পাঁচ লোক বসে আছেন, আর সামনে চুলী জ্বলছে। কাছে গিয়ে দেখেন, চিতা এবং জিজ্ঞাসা করেই শুনলেন, 'জননী'।

কাজ শেষ বেশ তখনই হয়ে গেল। রাত্রেই হুগলী চলে এলেন। রাত্রে বিশেষ কিছু বল্লেন না। সকালেই মাকে নিয়ে কোলকাতায় চলে এলেন।"

অলৌকিক বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ

১৩৮৫ সালের ৫ই শ্রাবণ (২২শে জুলাই ১৯৭৯) তারিখে যুগান্তর পত্রিকায় রবিবারের 'সাময়িকী'তে গৌরাঙ্গ ভৌমিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) বলেছিলেন—

— (রবীন্দ্রনাথ) জিজ্ঞেস করেছেন— ভূতে বিশ্বাস করি কিনা?

— করি, আমি বলেছিলাম।

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ একবার প্ল্যানচেটে তাঁর বৌঠানের স্পিরিট আনিয়ে ছিলেন। প্ল্যানচেটে যে লেখাটা প্রথম বেরিয়ে ছিল সেটা এই— খোকন, তুমি কি যে করো

গল্পটা বলে রবীন্দ্রনাথ রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। এবং আরও একটি ঘটনা বলেছিলেন—

সবার ইরিপ্ল্যাসে আক্রান্ত হয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়েছিল তাঁর। যন্ত্রণায় তখন তিনি অজ্ঞান। হঠাৎ দেখলেন বিরাট একটা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। মাটি থেকে অনেক ওপরে, শূন্যে, ভারহীন অবস্থায়, চারদিকের কোথাও দিকচক্রবাল রেখা নেই।

জ্ঞান ফিরতে দেখেন নীলরতন সরকার তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন বিস্মিত মুখে। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল মুহূর্তের জন্য তিনি এই পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিলেন।'— (রবীন্দ্রনাথ ও আমি)

গোপালচন্দ্র রায়

গোপালচন্দ্র রায়ের জন্ম ৩০ চৈত্র ১৩২২ (১২ এপ্রিল ১৯১৬) হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত থানুলিয়া গ্রামে। পিতা তারিণীচরণ রায়, মাতা নগেন্দ্রবালা রায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ.। *ভারতবর্ষ* মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন এক দশক। নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ ছিলেন টানা ৪৩ বছর। রবীন্দ্র-গবেষক রূপে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে কিছু কাল কাজ করেছেন। গবেষণার পাশাপাশি যুক্ত থেকেছেন গ্রামোন্নয়নের কাজেও। গান্ধি, নেতাজিসহ দেশ-বিদেশের বহু প্রথিতযশা মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন।

বই লিখেছেন প্রায় ৮০টি। শরৎচন্দ্রের প্রামাণ্য জীবনীকার। তথাপি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দচর্চাতেও তাঁর অনায়াস বিচরণ। বহু পুরস্কারে সম্মানিত নিরহংকার এই মানুষটি এখন খণ্ডে খণ্ডে রচনা করে চলেছেন রবীন্দ্রনাথের জীবনী।

বাংলা সাহিত্যে ভূতের গল্পের প্রাচুর্য কিছু কম নয়। অভাব আছে সেইরকম কাহিনির যা অলৌকিক হয়েও সত্যি। কয়েকজন প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের ব্যক্তিজীবনে প্রত্যক্ষ করা ভৌতিক অভিজ্ঞতা ধরা রইল এই সংকলনে। প্রথম পাঠে এগুলি নিছক ভূতের গল্প, বাস্তব ও পরাবাস্তবের মধ্যেকার সীমারেখা বিলীন হয়ে যায় পাঠান্তরে।